Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা তানজিল লিয়া

রোলঃ 228022222


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা তানজিল লিয়া

রোলঃ 228022222

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামীমা তানজিল লিয়া , আইডিঃ 228022222 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

-

(স্বাক্ষর)

**শামীমা তানজিল লিয়া**

আইডিঃ 228022222

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র

ভূমিকা ..... 5
উম্মার পরিচিতি ও প্রকৃতি ..... 7
বিভেদ একটা বাস্তবতা ঐক্য অপরিহার্য---- ..... 9
বিভেদের স্বরূপঃ ..... 9
বিভেদের কারণ সমূহ: ..... 15
উম্মাহর মাঝে কেনো এতো বিভেদ? ..... 19
মতভেদ কখন বিভেদ হয় ..... 21
মাযহাবকে আসাবিয়াতের কারণ বানানো– ..... 22
ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব ..... 28
বিভেদের অবকাশ ও আল্লাহর হিকমত ..... 30
বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মার অবস্থা ..... 33
বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা ..... 36
মায়ারূফ ও মনকার– ..... 91
অতঃপর ঐক্যের পথে ..... 100
উম্মতের ঐক্যের জন্য আমাদের করণীয় ..... 106
উপসংহার ..... 106
রেফারেন্স - ..... 109

# ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহ—বিশ্বাস, ইবাদত-অনুশীলন ও নৈতিক আদর্শের একটি অভিন্ন ছাতার নিচে গড়ে উঠা বৈশ্বিক মানবসমষ্টি—ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ন্যায়, করুণা ও সৌহার্দ্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আল-কুরআনের নির্দেশ "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ" (সূরা আম্বিয়া ২১:৯২) উম্মাহকে একক দেহেরূপে কল্পনা করে, যার প্রত্যেক শিরা-উপশিরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল থাকে। অতীতে যখন এই ঐক্য বাস্তব রূপ পেয়েছিল—মদিনার মসজিদ-নববীতে আবু বকর, উমর ও আলীর কাঁধে-কাঁধ রেখে উচ্চারিত "হাঁ"-এর ঐকমত্যে; বা উমাইয়া-আবাদীর জ্ঞানমণ্ডলে আল-আন্দালুসের পরিব্যাপ্ত আলোকে—তখনই মানবসভ্যতা বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সুবিচারে এক স্বর্ণালি যুগের স্বাদ পেয়েছে।

কিন্তু বিশ্বায়নের এই বিস্ফারিত প্রেক্ষাপটে ভূ-রাজনৈতিক সীমারেখা, ভাষা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, সামরিক-অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব উম্মাহকে ছিন্নভিন্ন করে রেখেছে। কোথাও শিয়া-সুন্নি উত্তেজনা, কোথাও জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক স্বার্থান্বেষণ, কোথাও আবার বৈশ্বিক শক্তি-রাজনীতির নিপুণ বিভাজন কৌশল—এই সবকিছু ঐক্যের আদর্শের সাথে এক ধরনের ক্রমাগত টানাপড়েন সৃষ্টি করেছে। তার ফলশ্রুতিতে আমরা আজ চাক্ষুষ করি—গাজা-জেরুজালেম থেকে কাশমীর, সিরিয়া, সুদান বা ইয়েমেন পর্যন্ত—মুসলিম জনগোষ্ঠীর দুর্দশা, অপার সম্ভাবনার অপচয়, এবং আস্থাহীনতার ঘনীভূত মেঘ।

এখানেই 'উম্মাহর ঐক্য' ভাবনাকে নতুন বৈজ্ঞানিক-সামাজিক পাঠে, সমকালীন বাস্তবতায় ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে এ ঐক্য কখনো নিছক আবেগাত্মক আহ্বান ছিল না; বরং এটি ছিল শাসনব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণ কাঠামো, জ্ঞান-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এবং সমাজকল্যাণমূলক অর্থনীতির উপর ভিত্তিশীল এক বাস্তব প্রক্রিয়া। আজকের গবেষণায় তাই—

1. ঐতিহাসিক তলভূমি অনুসন্ধান: নবী করীম (সা.)-এর মদীনার সনদ, খুলাফায়ে রাশেদীনের ইনসাফ-ভিত্তিক শাসন, ও উমাইয়া-আব্বাসীয় যুগের সাংগঠনিক বিবর্তন থেকে শুরু করে উসমানীয় ইমারতের অন্তিমকাল পর্যন্ত—কোথায়, কেন ও কীভাবে ঐক্যের শিকড় দৃঢ় বা দুর্বল হল, তার বিশ্লেষণ।

2. সমসাময়িক বাস্তবতা নিরীক্ষণ: জাতিসংঘভুক্ত ৫৬টি মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র, তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত-সহযোগিতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, গণতান্ত্রিক-সামরিক শাসনপদ্ধতি, এবং বিশ্বমিডিয়ার বয়ান—সবই কিভাবে উম্মাহর অন্তর্গত মেলবন্ধনকে প্রভাবিত করে, তার সমীক্ষা।

3. নৈতিক-আধ্যাত্মিক ভিত্তি পুনর্বিন্যাস: কুরআন-সুন্নাহ, মাকাসিদুশ-শারিয়াহ ও আখলাকিয়াতের আলোকে ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এক সামগ্রিক মূল্যবোধভিত্তিক রূপরেখা প্রস্তুত, যা আধুনিক মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

4. কৌশলগত পথরেখা উত্থাপন: প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-অর্থনীতি, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা নেটওয়ার্ক, হালাল শিল্প-বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ফোরাম, ও পরিবেশ-সচেতন বৈশ্বিক উদ্যোগ—এসবের মধ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা।

এই থিসিস, "মুসলিম উম্মার ঐক্য: একটি ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচনা," উপরের চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে। গবেষণা-পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক-বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ, ক্ষেত্রসমীক্ষা, পরিসংখ্যানগত মডেলিং, ও তুলনামূলক রাজনৈতিক-সামাজিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে একদিকে প্রাচ্যবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের নীতিবোধ, অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তক ও উন্নয়ন-বিশ্লেষকের অনুসন্ধান সমন্বিত হয়।

আমাদের প্রত্যাশা, এই গবেষণাপ্রয়াস শুধু একাডেমিক আলোকসম্পাতের সীমায় আবদ্ধ থাকবে না; বরং নীতি-নির্ধারক, ইমাম-আলেম, শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা এবং সাধারণ মুসলিম নাগরিকের মধ্যে একটি নবীন 'ওয়াহ্‌দাহ-চেতনা' (ঐক্য-সচেতনতা) জাগরিত করবে। কেননা উম্মাহর ঐক্য শক্তিমান হলে, বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত হয়; আর তা দুর্বল হলে, অবিচার ও অস্থিতিশীলতা মানবসমাজকে গ্রাস করে। অতএব, এই থিসিসের প্রতিটি অধ্যায় একাধারে অতীতের জ্যোতি, বর্তমানের প্রতিবিম্ব এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ উপস্থাপনের আন্তরিক প্রয়াস।

# উম্মার পরিচিতি ও প্রকৃতি

কোরআনের পরিভাষায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উম্মাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কতকগুলো মূলনীতির ভিত্তিতে যে জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদেরকে বলা হয় উম্মাহ।

মানব সমাজের উপর আল্লাহর প্রভৃত্বের শৃংখল চাপিয়ে মানুষের বিচিত্র গোলামী থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আল্লাহর নবীরা প্রেরীত হয়েছেন, তারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। সেই ঐক্যবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে কোরআনের ভাষায় উম্মাহ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সমস্ত নবীদের অনুসারীদের সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ বিশ্বের আদিকাল হতে অন্তকাল পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষেরা তাওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে বা করবে তারা সবাই এই উম্মাহর সদস্য। কিন্তু যেহেতু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পর পূর্বতন সকল শরীয়ত পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, তাই আজকের মুসলিম উম্মাহ বলতে আমরা শেষ নবীর অনুসারীদের বুঝবো।

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যক্তি সত্বায়, তাঁর মিশনে ও সাফল্যে, তার উপস্থাপিত আদর্শের ব্যাপকতায় ও কার্যকারিতায় এবং তার নবুয়তি জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সর্বশ্রেষ্ট, তাই তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন। পক্ষান্তরে তিনি মানবিতিহাসের সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তার উপস্থাপিত দ্বীন ও শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তাই তাঁর অনুসারীগণ বা আজকের মুসলিম উম্মাহ মর্যাদায় ও দায়ীত্বে শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ। এই শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হলো মূলনীতি ভিত্তিক ঐক্যের শ্রেষ্ঠত্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে জাতি বলা হয়, উম্মাহ তার সমার্থক নয়। ভাষা, সংস্কৃতি ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে একটা জাতি গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে সুনির্দিষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা উম্মাহর প্লাট ফরমে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ও অসংখ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা বা তথাকথিত অভিন্ন স্বার্থের টানা-পোড়নে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী অভিন্ন আদর্শে একাকার হয়ে যায়।

অনেকগুলো ইউনিটের সমন্বয়ে সমষ্টি গঠিত। ইউনিটগুলোর শুধু সংখ্যাধিক্যে নয় বরং সতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ইউনিটের গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্বেই শ্রেষ্ঠতর সমষ্টি গড়ে উঠে। যেমনি মূলনীতি ভিত্তিক ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন ছাড়া সতন্ত্রভাবে ইউনিটগুলো কোন সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে না, যদিও

তারা সতন্ত্রভাবে গুণগত মানদন্ডে উন্নত হয়। তেমনি গুণগত মানদন্ডে অনুন্নত ইউনিট গুলোর ঐক্যবদ্ধ সমষ্টি কাংখিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংখ্যার স্বল্পতা ও গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্বে মহীয়ান হয়ে যায়। কিন্তু গুণগত মানের অবনতির কোন বিকল্প নেই। তাই ব্যক্তির মানেই সমষ্টির মানোন্নয়ন। সামষ্টিক মূল্যবোধের নিরিখেই ব্যক্তিমান উন্নত হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির এই সমন্বিত উন্নয়নই হলো ইসলামী ঐক্যের ফসল। কোরআনে এই সমন্বিত চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মুসলিম উম্মাহর বিন্যাসে।

আরবের শতধাবিচ্ছিন্ন বেদুঈন সমাজে যখন নুন্যতম মানবীয় মূল্যবোধও চরমভাবে পদদলিত ছিলো। ব্যক্তি চরিত্রের চরম অবনতি ঘটেছিলো। ঐক্যবদ্ধ মানবীয় মূল্যবোধের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যেত না। তখন আল্লাহর নবী সমাজের ঐ সমস্ত লোকদের নিয়েই গড়ে তুলেছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ। মূলনীতির প্রতি অটল বিশ্বাসে, ব্যক্তি চরিত্রের চরম বিকাশে, পারস্পারিক আস্থা প্রতিষ্ঠা করে পারস্পারিক সহানুভুতি ও সহযোগীতায়, আত্মসম্মান ও ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামষ্টিক স্বার্থের লক্ষ্যে ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জনের অনুভূতি সৃষ্টিতে, কাংখিত মানবীয় গুণাবলীর চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধনে তথা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে মানবেতিহাসের চরম ও পরম গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়।

ইতিহাসের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চৌদ্দশত বছর পরেও ইসলামী ঐক্যের মূলনীতি অবিকৃত রয়েছে। মহানবীর শিক্ষাভান্ডার ফলে-ফুলে বিকশিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর পথ নির্দেশে ভাস্কর হয়ে আছে। কিন্তু আজকের মুসলিম উম্মার বাস্তব অবস্থা ভিন্ন রূপই তুলে ধরে।

আজ সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর সদস্য সংখ্যা ১৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। পাক-বাংলা-ভারতীয় উপমহাদেশেই মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি। এই বিপুল সংখ্যা উম্মাহর শক্তিতে সহায়ক হতে পারছে না। এর মূল কারণ হলো পরম কাংখিত ঐক্যের অভাব। আকিদা-বিশ্বাসে ও কর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তারা বিভিন্ন দলে ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে। এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে, রাসুলের রিসালতে ও আখিরাতের বিশ্বাস ও এক কাবাকে কিবলাহ মানার ঐক্য থাকা সত্বেও মুসলিম উম্মাহ শতধাবিচ্ছিন্ন। ইসলামী ভাতৃত্বের অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত। দলাদলী, সংঘর্ষ, মারামারি, কুৎসা, ফতোয়াবাজী ও দলীয় কোন্দল মুসলিম মানসে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই বিভেদের বিষক্রিয়া হিসেবে অনেকে ইসলামী অনুশাসন থেকে দূরে সরে গেছেন, আবার অনেকে এই বিভেদের ব্যাপকতায় হতাশ হয়ে বিভেদকেই চরম বাস্তবতা বলে মেনে নিয়ে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পন করেছেন। এ'দুটোই নেতিবাচক চিন্তা ও মূলতঃ সঠিক ইসলামী জ্ঞানের

অভাবেরই ফসল।

## বিভেদ একটা বাস্তবতা ঐক্য অপরিহার্য----

## বিভেদের স্বরূপঃ

মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধরনের বিভেদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) ইসলামের মূল আকিদা ও বিশ্বাসে বিভেদ।

এই ধরনের বিভেদ ঈমানের পরিপন্থি। যারা এই বিভেদের অপরাধে অপরাধী তারা মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(২) ইসলামের মূল আকিদার শাখা-প্রশাখায় বিভেদ। এই ধরনের বিভেদ প্রথমতঃ ঈমানের পরিপন্থি বলে মনে না হলেও পর্যায়ক্রমে মূল আকিদা ও বিশ্বাসকে দূর্বল করে ফেলে। ফলে ইসলামী ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) আকিদা-বিশ্বাসে নয়, বরং শরীয়তের প্রয়োগ পদ্ধতিতে বিভেদ। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগে কিংবা নীতিমালার প্রয়োগ পদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয়ে বিরোধ। ফিকাহর বিভিন্ন মতামতও এই পর্যায়ের বিভেদ। এই মত পার্থক্য বিভেদ পর্যায়ভূক্ত নয়। এটা শুধু নির্দোষই নয় বরং কল্যাণকর ও অপরিহার্য।

(৪) আচার অনুষ্ঠান ও রসম-রেওয়াজের বিভেদ। এই বিরোধ মূলতঃ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে সৃষ্টি হয়। ইসলামের সঠিক জ্ঞান বা কোরআন-হাদিসের জ্ঞানের সম্প্রসারণই এই ধরনের বিরোধের নিরসন করতে পারে।

(৫) ইসলামের সীমার লংঘন না করে কিছু নবতর সংযোজন, যা প্রথমতঃ আদৌ বিভেদ মুলক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে জাহেল ও স্বার্থপর লোকদের দ্বারা বিভেদের রূপ ধারণ করেছে।

এই বিরোধ নিরসনে সংস্কার মুলক সাহসিক আন্দোলন অপরিহার্য।

স্থান-কাল, বর্ণ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষ এই আদর্শের অনুসারী। সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসের বিবর্তনে, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই দ্বীন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। ইতিহাসে প্রতিটি অধ্যায়ে সকল স্তরের অনুসারীরা তাদের চিন্তা, মেধা ও বুদ্ধির সাহায্যে এই আদর্শকে বুঝবার ও বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এ আদর্শ কোন সীমিত আদর্শ নয়। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য এক বিপ্লবাত্মক সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা। বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর জনিত সমস্যাও একটি বাস্তবতা।

যারা এই জটিল বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন তারা মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাসে ভীত হয়ে পড়েন এবং এই বিরোধকে অনিরাময়যোগ্য রোগ বলে মেনে নিয়ে ইতিহাসের সামগ্রিক বিভেদকে নিতান্ত বাস্তবতা বলে মেনে নেন এবং অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করেন। কিন্তু বিভেদের এই ইতিহাসে ভীত হয়ে আত্মসমর্পনের পথ কোরআন ও হাদিসের প্রদত্ত দায়ীত্ব থেকে এড়িয়ে চলারই পথ। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যে সমস্ত বিভেদ ও অবৈধ বিরোধের উদ্ভব হয়েছে তা প্রধানতঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সে সমস্ত কারণে আমাদের পূর্বের ঐ দুই উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলির উৎপত্তি হয়, আমাদের উম্মতের মধ্যে সেই রোগ সমূহ নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুকরণের ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে রাসুলে করীম (সঃ) বার বার সাবধান করে দিয়েছেন।

বোখারী শরীফের হাদিসে বলা হয়েছে,

قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشير و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضـ
لا تبعتموه و قلنا يا رسول الله اليهود و النصارى قال لمن ؟ (আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের পূর্বতন উম্মতদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে- প্রতি পদক্ষেপে- প্রতি বিষয়ে। এমন কি তারা যদি (পূর্বতন লোকেরা) কোন গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করেছে, তবে তোমরা তারও অনুকরণ করবে (অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিটি কর্মের অন্ধ অনুকরণ করবে) অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, পূর্বতন লোকদের অর্থ কি- ইহুদী ও খৃষ্টান সমাজ? আল্লাহর নবী জবাবে বললেন, তারা ছাড়া আর কারা?)

আল্লাহর নবী যত বেশী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামদের পরবর্তীযুগে উম্মতে মুহম্মদীর অনুসারীরা ততো বেশী ঐ সর্বনাশা অনুকরণে লিপ্ত হয়েছে এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতেও কোন্দল করতে নিরস্ত হয়নি। এই ধারা আজ ও অব্যাহত রয়েছে।

তিরমিজির হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على احدى و سبعين و اثنين و سبعين فرقة و النصارى مثل ذلك وتفرق أمتى على ثلاث و سبعين واية أخرى كلها في النار الا واحدة ما انا عليه و اصحابي - الجماعة - السواد

(لترمذى

(হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন। ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো, খৃষ্টানদের অবস্থাও অনুরূপ ছিলো, এবং আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এসব ফিরকা সমুহের মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামী হবে (ঐ একটি দলের পরিচিতি দিতে গিয়ে বললেন) তারা ঐ পথে চলবে যে পথে আমি ও আমার সাহাবারা চলেছি। তারা হলো নাজাতপ্রাপ্ত দল- মহান দল।)

এই হাদিসের রেওয়ায়েতের মান সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সে সব চুল চেরা আলোচনায় না গিয়ে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই রেওয়ায়েতটিকে হাদিসে রাসুল হিসেবে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ইমাম তিরমিজির মত ব্যক্তি চারজন বিশিষ্ট সাহাবীদের রেওয়া েেয়তে হাদিসটি সংকলন করেছেন।, হাদিসের কিতাব সমুহে এই হাদিসটির বর্ণনায় আরো ১১ জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। সর্বোপরি কোন মোহাদ্দিসই হাদিসটিকে বানানো হাদীস বলে উল্লেখ করেন নি। রেওয়াতের মানদন্ডের ভিত্তিতে কোন হাদিসের মৌলিকত্বকে ৬অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে উপরের বোখারী শরীফের হাদিসটির উপস্থিতিতে এই হাদিসটি তারই পরিপূরক বলে প্রতীয়মান হয়। ৭১, ৭২ বা ৭৩ সংখ্যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে বেশী, কিন্তু ইহুদী বা খৃষ্টানদের মধ্যে ৭১ বা ৭২ ফিরকার সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কথা এতে বুঝানো হয়নি। তেমনি উম্মতে মুহম্মদীর মধ্যে ও পথভ্রষ্ট লোকদের ফেরকার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা এর অর্থ নয়। কোরআন ও হাদিসে সংখ্যা বর্ণনা সম্পর্কে যে রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার আলোকে হাদিসটির মর্ম হলো; আল্লাহর নবী তার উম্মতকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ সম্পর্কে সর্তক করতে গিয়ে বলেছেন যে নবীদের শিক্ষাকে অবিকৃতভাবে অনুসরণ না করার ফলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যত দল ও উপদলের উদ্ভব হয়েছিল, এই উম্মতের মধ্যে তাদের চেয়েও বেশী দল বা উপদলের উৎপত্তি হবে। হাদীসের শেষাংশের মর্ম সামনে রাখলে এই সতর্কবাণীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ হক পন্থি দল একটি, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। কোরআনের আয়াতে যাদেরকে )امة واحدة( )অভিন্ন জনগোষ্ঠী) ও )الامن رحم ربك( )আল্লাহর অনুগহ প্রাপ্ত দলই মাত্র) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হক পন্থি দলের পথ একটি। যাকে কোরআনের আয়াতে صراطى مستقيما( )আমার সোজা পথ) বলা হয়েছে। যারা ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরণ করে না বা বিভেদে লিপ্ত হয় না। হাদীসের শেষ অংশে এই সিরাতুল মুস্তাকিমের ব্যাখা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নবীর ভাষায় তিনি ও

তাঁর সাহাবাদের পথই সিরাতুল মুস্তাকিম। যা বিরোধের পথ রোধ করে। অসংখ্য বিভেদের মাঝে ঐক্যের রাজপথ একটিই। সেই পথের পথিকরাই নাজাত প্রাপ্ত দল। ভিন্ন পথের পথিকরা বিভেদপন্থী বা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত। কোরআনের ভাষায় )لا تتبعوا السبل( 'বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না' বলে যাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে ঐ হক পন্থী দলের বা সিরাতুল মুস্তাকিমের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা ছাড়া অপরাপর সকল দলই বা অপরাপর সকল পথই বিভ্রান্তির অন্য কথায় তারা সবাই জাহান্নামী। ঐ একটি মাত্র দলের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হাদিসের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য একটি রাজপথের সঠিক চিত্র চিত্রিত হ'লে। বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

কোরআনের উপস্থাপিত পথ একটিই, সে পথে চলতে বারে বারে ডাক দেয়া হয়েছে। কোরআনের প্রথম সুরা ফাতেহায় ও আমাদেরকে দোয়া শেখানো হয়েছে ঐ এক পথে চলার জন্যে।

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল ও সোজা পথ প্রদর্শন করুন। যে পথে আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকেরা চলেছে, ঐ বক্রপথে নয় যে পথে অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত লোকেরা চলেছে।)

অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত পথ বলতে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে। ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের অনুসরণ যুগে যুগে বিচিত্র রূপে পথে মোহ সৃষ্টি করেছে। কোথাও ধর্মের মোহ সৃষ্টি করে কোরআনের উপস্থাপিত সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আবার কোথাও আধুনিকতা ও যুগের চাহিদার নামে উম্মতে মুহম্মদীকে দ্বীনের আনুগত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের অনুসরণ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিচিত্র। ইসলামী ইতিহাসের

ব্যাপকতর বিভেদের ইতিহাসের সুক্ষ বিশ্লেষণ এই সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

অনুকরণের বিচিত্র রূপরেখা হৃদয়ংগম করানোর নিমিত্তে আল্লাহতায়ালা কোরআনে মজিদে আগের উম্মতদের ইতিহাস কাহিনী আকারে উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র কাহিনী হিসাবে পড়ার জন্য এসব ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি, বরং ঐ সব কাহিনীর মাধ্যমে আগের উম্মতদের মধ্যে সে সমস্ত রোগ সৃষ্টি হয়েছিল বা যে সমস্ত কারণে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছিলো সেগুলো ভাল করে বুঝে নেবার জন্যেই এ সবের অবতারণা। উদ্দেশ্য হ'লো ঐ সব রোগ বা কারণগুলো থেকে সরে থাকার সতর্কবাণী।

কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

فالقصص القصص لعلهم يتفكرون - )الاعراف ( (পূর্বতন (উম্মতদের) কাহিনী সমুহ বর্ণনা করো যেনো তারা চিন্তার খোরাক পায়)

إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون - )النحل( (এ সব কাহিনীতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে)

إن في ذلك لأية لقوم يعقلون - )النحل( (এ সব কাহিনীতে বুদ্ধিমান জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে)

كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون - )الروم ( (এ ভাবেই আমি বুদ্ধিমান জাতির জন্যে নিদর্শন সমুহ সবিস্তারে বর্ণনা করি)

قل هل يستوى الاعمى والبصير افلا تتفكرون - )الانعام (

(বলো, দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ও অন্ধব্যক্তি কি সমপর্যায়ের, তারা কি চিন্তা করে দেখবে না?)

এমন ধরণের আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মিল্লাত পথে ডাক দিয়েছেন।
কোরআনে মজিদে পূর্বতন উম্মতদের মধ্যে ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলদের ইতিহাস যতো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অন্যান্য উম্মতদের ব্যাপারে ততো বেশী বলা হয়নি, কেননা, অনুকরণের সর্বনাশা প্রতিযোগিতায় এদের ইতিহাসই আমাদের উম্মতদের মূল চারন ক্ষেত্র। কোরআনে এরসাদ হয়েছে।

قالوا كونوا هو دا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا - )البقرة(

(তারা দাবী করে বলতো যদি তোমরা ইহুদী বা খৃষ্টানদের আদর্শ গ্রহণ করো তবেই সঠিক পথের দিশা পাবে। তুমি তাদেরকে বলো, (তোমাদের দাবী ঠিক নয়) বরং ইব্রাহিমের মিল্লাতই সঠিক)

ما كان ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما - )ال عمران (

(ইব্রাহিম ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সঠিক মুসলমান)

হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ইসা (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বংশধর ও পরবর্তী যুগের নবী। তাদের উপর যে কিতাব- তাওরাত বা ইনজিল নাজিল হয়েছিলো, তাতে তাদের উম্মতকে মুসলিম উম্মত বলেই চিত্রিত করা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা নবীর শিক্ষা

ভুলে গিয়ে তাদের মিল্লাতের নাম পালটিয়ে নেয়। ইহুদীরা তাদের নাম ইহুদী বা ইসরাইলী করে ফেলে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা তাদের নাম মসিহি বা নাসারা করে ফেলে। ইসলামী মিল্লাতের ঐক্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ) থেকে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ইসা (আঃ) তথা হযরত ইসমাইল (আঃ) ও আমাদের নবী পর্যন্ত একই সুত্রে গ্রথিত। এই ঐক্য অভিন্ন জীবনাদর্শের দিক নির্দেশ করে। ইহুদী বা নাসারাবাদ হলো বিভেদ ও বিরোধের পথ, যা মুসলিম ঐক্যের পরিপন্থি। এই বিরোধের ইতি করে ইসলামী ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই হ'লো কোরআন ও হাদিসের লক্ষ্য।

## বিভেদের কারণ সমূহ:

যে সমস্ত মৌলিক কারণগুলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-বন্ধনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে- ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত সার এখানে উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে এই সব কারণগুলোই মূলতঃ আমাদের পূর্বতন দুইটি জাতির মধ্যেও বিভেদের মূল কারণ ছিলো; সেগুলো হলো;

(১) ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব।

(২) মানুষের জ্ঞান যে সব অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয়ের সমাধান করতে ব্যর্থ। সেই সব বিষয়কে গবেষনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা।

(৩) মনোবৃত্তির দাসত্ব।

(৪) রীতি-নীতির গোলামী ও অন্ধ অনুকরণ।

(৫) পারস্পারিক অনাস্থা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দাসত্ব।

(৬) চিন্তা ও কর্মের বিরোধ।

**বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার কিছু ছুরতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-**

১. দ্বীন ইসলামে দাখিল না হওয়া, ইসলামের বিরোধিতা করা বা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া-এগুলো সর্বাবস্থায় দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়, যেগুলোকে পরিভাষায় 'জরুরিয়াতে দ্বীন' বলে, তার কোনো একটির অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা হচ্ছে ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া), যা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার জঘন্যতম প্রকার। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দ্বীন ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা।

২. দ্বীনে ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী আকীদাসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। এটাও বিচ্ছিন্নতা। হাদীস

শরীফে কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করা হয়েছে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য দুটি জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণের আদেশ করা হয়েছে : 'আসসুন্নাহ' এবং
'আলজামাআ'। এ কারণে যে জামাত সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল থাকে তাদের নাম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।'
তাদের পথ থেকে যারাই বিচ্যুত হয়েছে তারাই এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। অতপর কোনো দল ও ফের্কার জন্ম দিলে তা তো আরো মারাত্মক।

৩. আলজামাআর ব্যাখ্যায় উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রসঙ্গে প্রথম যে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার কোনো একটি ভঙ্গ করা কিংবা কোনো একটি থেকে বিচ্যুত হওয়া পরিষ্কার বিচ্ছিন্নতা।

আর 'আলজামাআর' ব্যাখ্যায় উল্লেখিত চতুর্থ বিষয়টি অর্থাৎ মুসলিম সমাজের ইজতিমায়ী রূপরেখা বিনষ্ট করা বা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে তা বিনষ্ট হয় তাও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শামিল।

ফুরূয়ী মাসাইল বা শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের যে মতপার্থক্য, যাকে ফিকহী মাযহাবের মতপার্থক্য বলে, তা দ্বীনের বিষয়ে
বিচ্ছিন্নতা নয়। আগেও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কারণ ফিকহের এই মাযহাবগুলো তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণেরই মাযহাব। এগুলো 'বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ, যা স্বয়ং গন্তব্যের মালিকের পক্ষ হতে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। ফির্কা ও ফিকহী মাযহাবের পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়া খুবই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।

সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ফিকহের মাযহাব ও ফিকহের মতপার্থক্য ছিল, অথচ তাঁরা খেয়ালখুশির মতভেদ কখনো সহ্য করতেন না। তাদের কাছে এ জাতীয় মতভেদকারীদের উপাধি ছিল 'আহলুল আহওয়া', 'আহলুল বিদা ওয়াদ দ্বলালাহ' এবং 'আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা'।

মনে রাখতে হবে, ইমামগণের ফিকহী মাযহাবের যে মতপার্থক্য তাকে বিভেদ মনে করা অন্যায় ও বাস্তবতার বিকৃতি এবং সাহাবায়ে কেরামের নীতি ও ইজমার বিরোধিতা। আর এ পার্থক্যের বাহানায় মাযহাব অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে তাদের নিন্দা-সমালোচনা করা সরাসরি বিচ্ছিন্নতা, যা দ্বীনের বিষয়ে বিভেদের অন্তর্ভুক্ত।

উম্মাহর বিভেদের মূল কারণ কী?মুসলিম উম্মাহ, যারা একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভাজনের শিকার হয়েছে। এই বিভেদ শুধু

মুসলিম সমাজের শক্তিকে দুর্বল করেনি, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতাকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। উম্মাহর বিভেদের মূল কারণগুলো জটিল এবং বহুমুখী, যা ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রবন্ধে আমরা এই বিভেদের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করব।

১. ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্যমুসলিম উম্মাহর বিভেদের শিকড় প্রায়শই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধর্মীয় ব্যাখ্যার পার্থক্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো:শিয়া-সুন্নি বিভেদ: নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর খিলাফতের প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল মনে করত, খলিফা হওয়ার যোগ্যতা রক্তের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে (শিয়া), অন্যদল মনে করত, নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে (সুন্নি)। এই মতপার্থক্য ধীরে ধীরে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজনে রূপ নেয়।ধর্মীয় মতবাদ ও ব্যাখ্যা: বিভিন্ন ফিকহ বা ধর্মীয় আইনশাস্ত্রের স্কুল (যেমন, হানাফি, শাফিঈ, মালিকি, হাম্বলি) এবং অন্যান্য মতবাদের উদ্ভব মুসলিম সমাজে ভিন্নতা তৈরি করেছে। কখনো কখনো এই পার্থক্য অসহিষ্ণুতা ও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াইরাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াই মুসলিম উম্মাহর বিভেদের একটি প্রধান কারণ। এর মধ্যে রয়েছে:ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র: ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম ভূখণ্ডে "বিভাজন ও শাসন" নীতি প্রয়োগ করে জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতার বীজ বপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যে সাইকস-পিকো চুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম সীমানা তৈরি করা হয়, যা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা: বর্তমানে ইরান ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে দুর্বল করছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে (যেমন, ইয়েমেন, সিরিয়া) আরও তীব্র হয়েছে।অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি: অনেক মুসলিম দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের পথে বাধা।

৩. অর্থনৈতিক বৈষম্যঅর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদের অসম বণ্টন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদের আরেকটি কারণ। তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এই বৈষম্য:ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরি করে।অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে হতাশা ও অসন্তোষ বাড়ায়, যা চরমপন্থা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

৪. জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাআধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতিগত পরিচয়ের ভিন্নতা ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ:আরব, তুর্কি, পারসিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য তাদের একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা।জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিম দেশগুলোকে

তাদের নিজস্ব স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগী করে তুলেছে, যা উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের ধারণাকে দুর্বল করে।

৫. শিক্ষার অভাব ও ভুল প্রচারণাশিক্ষার অভাব এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভুল প্রচারণা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদকে আরও গভীর করেছে। কিছু ক্ষেত্রে:ধর্মীয় নেতারা বা গোষ্ঠী নিজেদের মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অসহিষ্ণুতা ছড়ায়।বিদেশী শক্তি বা চরমপন্থী গোষ্ঠী মিডিয়া ও প্রচারণার মাধ্যমে বিভেদকে উৎসাহিত করে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

৬. বাহ্যিক হস্তক্ষেপবিশ্বের প্রভাবশালী শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহর বিভেদকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে। বাহ্যিক হস্তক্ষেপ, যেমন:মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক চাপ।অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা।প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মধ্যে ভিন্ন মতবাদ বা গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা।এই হস্তক্ষেপগুলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব বাড়ায়, যা বিভেদকে আরও তীব্র করে।বিভেদের পরিণতি উম্মাহর বিভেদের ফলে মুসলিম সমাজ

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে, রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয় এবং সামাজিকভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। এটি চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়, যা উম্মাহর অগ্রগতির পথে বড় বাধা।

# উম্মাহর মাঝে কেনো এতো বিভেদ?

মুসলিম উম্মাহ, যারা একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভাজনের শিকার হয়েছে। এই বিভেদ শুধু মুসলিম সমাজের শক্তিকে দুর্বল করেনি, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতাকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। উম্মাহর বিভেদের মূল কারণগুলো জটিল এবং বহুমুখী, যা ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রবন্ধে আমরা এই বিভেদের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করব।

**১.** ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্যমুসলিম উম্মাহর বিভেদের শিকড় প্রায়শই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধর্মীয় ব্যাখ্যার পার্থক্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো:শিয়া-সুন্নি বিভেদ: নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর খিলাফতের প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল মনে করত, খলিফা হওয়ার যোগ্যতা রক্তের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে (শিয়া), অন্যদল মনে করত, নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে (সুন্নি)। এই মতপার্থক্য ধীরে ধীরে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজনে রূপ নেয়।ধর্মীয় মতবাদ ও ব্যাখ্যা: বিভিন্ন ফিকহ বা ধর্মীয় আইনশাস্ত্রের স্কুল (যেমন, হানাফি, শাফিঈ, মালিকি, হাম্বলি) এবং অন্যান্য মতবাদের উদ্ভব মুসলিম সমাজে ভিন্নতা তৈরি করেছে। কখনো কখনো এই পার্থক্য অসহিষ্ণুতা ও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**২.** রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াইরাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াই মুসলিম উম্মাহর বিভেদের একটি প্রধান কারণ। এর মধ্যে রয়েছে:ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র: ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম ভূখণ্ডে "বিভাজন ও শাসন" নীতি প্রয়োগ করে জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতার বীজ বপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যে সাইকস-পিকো চুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম সীমানা তৈরি করা হয়, যা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা: বর্তমানে ইরান ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে দুর্বল করছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে (যেমন, ইয়েমেন, সিরিয়া) আরও তীব্র হয়েছে।অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি: অনেক মুসলিম দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের পথে বাধা।

**৩.** অর্থনৈতিক বৈষম্যঅর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদের অসম বণ্টন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদের আরেকটি কারণ। তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এই বৈষম্য:ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরি করে।অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে হতাশা ও অসন্তোষ বাড়ায়, যা চরমপন্থা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

**৪.** জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাআধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতিগত পরিচয়ের ভিন্নতা ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ:আরব, তুর্কি, পারসিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য তাদের একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা।জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিম দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগী করে তুলেছে, যা উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের ধারণাকে দুর্বল করে।

**৫.** শিক্ষার অভাব ও ভুল প্রচারণাশিক্ষার অভাব এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভুল প্রচারণা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদকে আরও গভীর করেছে। কিছু ক্ষেত্রে:ধর্মীয় নেতারা বা গোষ্ঠী নিজেদের মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অসহিষ্ণুতা ছড়ায়।বিদেশী শক্তি বা চরমপন্থী গোষ্ঠী মিডিয়া ও প্রচারণার মাধ্যমে বিভেদকে উৎসাহিত করে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

**৬.** বাহ্যিক হস্তক্ষেপবিশ্বের প্রভাবশালী শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহর বিভেদকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে। বাহ্যিক হস্তক্ষেপ, যেমন:মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক চাপ।অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা।প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মধ্যে ভিন্ন মতবাদ বা গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা।এই হস্তক্ষেপগুলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব বাড়ায়, যা বিভেদকে আরও তীব্র করে।

বিভেদের পরিণতি উম্মাহর বিভেদের ফলে মুসলিম সমাজ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে, রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয় এবং সামাজিকভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। এটি চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়, যা উম্মাহর অগ্রগতির পথে বড় বাধা।

# মতভেদ কখন বিভেদ হয়

সকল মতভেদ বিভেদ নয়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নবী ও রাসূলদের মাঝে কোনো বিভেদ ছিল না। তারা পরস্পর অভিন্ন ছিলেন। যদিও শরীয়তের বিধিবিধান সবার এক ছিল না, পার্থক্য ও বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা ছিল দলিলভিত্তিক, খেয়ালখুশি ভিত্তিক -নাউযুবিল্লাহ- ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল, ফুরূ বা শাখাগত বিষয়ে দলিলভিত্তিক মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়।

সবাই জানেন, দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.ও নবী ছিলেন। এক মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে দুজনের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য হল। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সুলায়মান আ.-এর ইজতিহাদ যে তাঁর মানশা মোতাবেক ছিল সেদিকেও ইশারা করেছেন। তবে পিতাপুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন। তো এখানে ইজতিহাদের পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু বিভেদ হয়নি। এই পার্থক্যের আগেও যেমন পিতাপুত্র দুই নবী এক ছিলেন, তেমনি পার্থক্যের পরও।

(দেখুন: সূরা আম্বিয়া (২১): ৭৮-৭৯)

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী (১১/৩০৭-৩১৯) ও অন্যান্য তাফসীরের কিতাব দেখে নেওয়া যায়।

## মাযহাবকে আসাবিয়াতের কারণ বানানো–

ফিকহী মাযহাবের অনুসারী কোনো ব্যক্তি বা দল যদি মাযহাবকে জাহেলী আসাবিয়াত ও দলাদলির কারণ বানায় তাহলে তার/তাদের এই কাজও নিঃসন্দেহে ঐক্যের পরিপন্থী এবং বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শামিল।

দেখুন, 'মুহাজিরীন' ও 'আনসার' কত সুন্দর দুটি নাম এবং কত মর্যাদাবান দুটি জামাত। উভয় জামাতের প্রশংসা কুরআন মজীদে রয়েছে। কিন্তু এক ঘটনায় যখন এ দুই নামের ভুল ব্যবহার হয়েছে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাম্বীহ করেছেন।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে এক মুহাজির তরুণ ও এক আনসারী তরুণের মাঝে কোনো বিষয়ে ঝগড়া হয়। মুহাজির আনসারীকে একটি আঘাত করল। তখন আনসারী ডাক দিল, يا للأنصار! হে আনসারীরা!; মুহাজির তরুণও ডাক দিল -يا للمهاجرين! হে মুহাজিররা!; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আওয়াজ

١ - ما بال دعوى الجاهلية কেমন জাহেলী ডাক! কী হয়েছে?

ঘটনা বলা হল-

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন জাহেলী ডাক ত্যাগ কর। এ তো দুর্গন্ধযুক্ত ডাক!

অন্য বর্ণনায় আছে, এতে তো বিশেষ কিছু ছিল না। (কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে তাহলে) সকলের কর্তব্য, তার ভাইয়ের সাহায্য করা। সে জুলুম করুক বা তার উপর জুলুম করা হোক। জালিম হলে তাকে বাধা দিবে। এটাই তার সাহায্য। আর মাজলুম হলে তার সাহায্য করবে (জুলুম থেকে রক্ষা করবে)।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৯০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৪/৬২, ৬৩

হাদীসের অর্থ হচ্ছে, কারো উপর জুলুম হতে থাকলে সাহায্যের জন্য ডাকতে বাধা নেই। কিন্তু ডাকবে সব মুসলমানকে। যেমন উপরোক্ত ঘটনায় আনসারী মুহাজিরদেরকেও ডাকতে পারতেন এবং মুহাজির আনসারীদেরকে ডাকতে পারতেন। কিংবা ভাইসব! মুসলমান ভাইরা! বলেও ডাকা যেত। কিন্তু এমন কোনো ডাক মুসলমানের জন্য শোভন নয়, যা থেকে আসাবিয়ত ও

দলাদলির দুর্গন্ধ আসে। কারণ তা ছিল জাহেলী যুগের প্রবণতা। ঐ সময় সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তি ছিল বংশীয় বা গোত্রীয় পরিচয়। ইসলামে সাহায্যের ভিত্তি হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফ।

'আল্লাহর রাসূল! আসাবিয়ত কী? বললেন, নিজের কওমকে তার অন্যায়-অবিচারের বিষয়ে সাহায্য করা।'-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫১১৯

তো ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, 'মুহাজির' ও 'আনসার' দুটি আলাদা নাম, আলাদা জামাত, আলাদা পরিচয়-এতে আপত্তির কিছু নেই। আপত্তি তখনই হয়েছে যখন নাম দুটি এমনভাবে ব্যবহার করা হল, যা থেকে আসাবিয়তের দুর্গন্ধ আসে। এ শিক্ষা ফিকহি মাযহাবের ভিত্তিতে আলাদা জামাত ও আলাদা পরিচয় কিংবা অন্য কোনো বৈধ বা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণী ও পরিচয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ নীতি সব ক্ষেত্রেই মনে রাখা উচিত।

**যে বিষয়গুলো ঐক্যের পরিপন্থী নয়–**

যেগুলোকে কোনো লোক ঐক্যের পরিপন্থী মনে করতে পারে অথচ তা উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্যই জরুরি। যেমন:

১. আহলে কুফর ও আহলে শিরক থেকে আলাদা থাকা। তাদের বাতিল বিষয়াদিতে সঙ্গ না দেওয়া। তাদের জাতীয় নিদর্শন ও সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা। তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা না রাখা। রাজনৈতিক প্রয়োজনে (মুসলিম উম্মাহর রাজনীতি হবে সর্বদা দ্বীনের অধীন) তাদের সাথে সন্ধির প্রয়োজন হলে তা শরীয়তের বিধান মোতাবেক হতে পারে।

২. 'আহলুল বিদআ ওয়াল ফুরকা'র সাথে তাদের বিদআত ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে একমত না হওয়া। তালীম-তরবিয়ত, সুলুক ও তাযকিয়ার প্রয়োজনে তাদের সাহচর্য গ্রহণ না করা। কারণ সাহচর্যের
দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। 'আহলুল আহওয়া'র সাহচর্য গ্রহণ করার বিষয়ে সাহাবা-তাবেয়ীন নিষেধ করেছেন।

৩. প্রকাশ্যে ফিসক-ফুজুরে লিপ্ত ব্যক্তিদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা।

৪. অন্যায় ও ভুল কাজে কারো সাহায্য না করা। আসাবিয়ত ও দলাদলির ক্ষেত্রে কাউকে সঙ্গ না দেওয়া।

৫. 'যাল্লাত' ( যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ভুল হয়েছে এমন) ক্ষেত্রে আকাবির ও মাশাইখের তাকলীদ না করা।

৬. জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা।

৭. ওয়াজ-নসীহত

৮. শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার করা।

৯. ইলমী আদব রক্ষা করে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে মতভেদপূর্ণ ইজতিহাদী বিষয়াদিতে দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়।

১০. কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনে শরীক না হওয়া, কিংবা বলুন, পশ্চিমাদের পদ্ধতিতে রাজনীতিকারী কোনো সংগঠনে শামিল না হওয়া।

দ্বীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির অর্থ, তাওহীদ বা অন্য কোনো মৌলিক বিষয় সরাসরি অস্বীকার করে কিংবা তাতে অপব্যাখ্যা করে তাওহীদের উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

হক সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পর এ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা কেবল জিদ ও হঠকারিতার কারণেই হয়ে থাকে। শাখাগত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক যে মতপার্থক্য তা এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ অনেক শাখাগত বিধানের ক্ষেত্রে স্বয়ং নবীগণের শরীয়তেও বিভিন্নতা ছিল।
অথচ তাঁদের সবার দ্বীন ছিল এক। তাঁরা সবাই ছিলেন তাওহীদপন্থী এবং অভিন্ন।

অন্য অনেক আয়াতের মতো উপরের আয়াতগুলোতেও স্পষ্ট নির্দেশনা আছে যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতভেদ হতে পারে না। এখানে মতভেদ অর্থই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

আর এই বিভেদের দায় ঐ মতভেদকারীকেই বহন করতে হবে। যারা হকপন্থী, তাদেরকে নয়। কারণ ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও মৌলিক আকিদা ও বিধান। যারা এর উপর আছে তারা তো মূল পথেই রয়েছে। যারা মতভেদ করেছে তারা এই পথ থেকে সরে গেছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাওহীদের বিষয়ে বা

দ্বীনের অন্য কোনো মৌলিক বিষয়ে হক থেকে বিচ্যুত হওয়া বা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করা খেয়ালখুশির অনুগামিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে ইসলামের অতুলনীয় ও ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাটিও লক্ষণীয় যে, যারা মৌলিক বিষয়ে অবিচার করা যাবে না; তাদের সাথেও ন্যায়বিচার করতে হবে।

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভেদ করো না। স্মরণ কর যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ একে অপরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা তো ছিলে অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

'তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে। আর এরাই তো সফলকাম।

'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং মতভেদ করেছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানসমূহ পৌঁছার পর। এদের জন্যই রয়েছে ভীষণ শাসিত্ম।
'যেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখ কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কুফরি করলে ঈমান আনার পর?! সুতরাং স্বীয় কুফরির দরুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

'পক্ষান্তরে যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল
থাকবে।'-সূরা আলে-ইমরান (৩): ১০২-১০৭

'হাবলুল্লাহ'-আল্লাহর রজ্জু অর্থ আলকুরআন এবং আল্লাহর সাথে কৃত বান্দার সকল অঙ্গিকার, যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গিকারটি এই যে, আমরা শুধু রবেরই ইবাদত করব, অন্য কারো নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই তাওহীদ ও কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। তাওহীদ ত্যাগ করে কিংবা কুরআনের কোনো বিধান থেকে বিমুখ হয়ে বিভেদ করো না। তো এখানেও ঐ কথা-ঐক্যের ভিত্তি তাওহীদ ও কুরআন।

আরো বোঝা গেল যে, তাওহীদপন্থী উম্মাহর পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। আর এ নেয়ামত হাসিল হবে সর্বপ্রকার 'আসাবিয়াত' থেকে মুক্ত হয়ে শুধু এবং শুধু ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং ইসলামী বিধিবিধানের আনুগত্যের দ্বারা। আউস ও খাযরাজের দৃষ্টান্ত স্মরণ করুন, এই নেয়ামতে তাঁরা এতই সৌভাগ্যশালী হয়েছিলেন যে, তাঁদের গোত্রীয় পরিচয় ছাপিয়ে গেল এবং দ্বীনী পরিচয়ে-'আনসার' নামেই তাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

'বাইয়িনাত' অর্থ কিতাব-সুন্নাহর অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল, যা থেকে বিমুখ হয়ে মতভেদ করার অর্থই হল এ বিষয়ে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা, যা সম্পূর্ণ গর্হিত ও বর্জনীয়। যেমন ঈমানদার ও তাওহীদপন্থীদের সাথে কাফির-মুশরিকদের মতভেদ। কট্টর বিদআতীদের মতভেদও অনেক সময় এই সীমানায় প্রবেশ করে। এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শাস্তি আখেরাতে মুখ কালো হওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন-
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه

أهل البدعة والفرقة

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মুখ উজ্জ্বল হবে এবং আহলুল বিদআহ ওয়াল ফুরকার মুখ কালো হবে।-তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫৮৪

এ থেকে বোঝা যায়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীগণ 'আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করার এবং বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন না হওয়ার' আদেশ পালন করছেন, যার পুরস্কার তারা দুনিয়াতে পেয়ে থাকেন পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মাধ্যমে। আর আখিরাতের পুরস্কার এই হবে যে, তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে যারা কালিমা পাঠ করেও সুন্নাহ ছেড়ে বিদআ অবলম্বন করবে কিংবা উম্মাহর ঐক্যে আঘাত করে 'আলজামাআ' এর নীতি থেকে বিচ্যুত হবে তাদেরও আশঙ্কা আছে আয়াতের কঠিন হুঁশিয়ারির মাঝে পড়ে যাওয়ার।

দল মূলত দুটি :

১. হিযবুল্লাহ বা আল্লাহর দল

২. হিযবুশ শয়তান বা শয়তানের দল।

যার অন্তরে ঈমান আছে এবং মুমিনদের সাথে মুয়ালাত ও হৃদ্যতা পোষণ করে আর কাফির-মুশরিকদের থেকে বারাআত ও সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে সে হিযবুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। তাকে হিযুবল্লাহ থেকে খারিজ করা কিংবা হিযবুশ শয়তানের দিকে নিসবত করা সম্পূর্ণ হারাম। হিযবুল্লাহর মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান, মুমিনদের প্রতি মুয়ালাত ও হৃদ্যতা এবং আহলে কুফর ও শিরকের সাথে মুআদাত ও শত্রুতা।

মুয়ালাত ও বারাআতের এই ইসলামী নীতি থেকে পরিষ্কার হয় যে, ঐক্যের অর্থ ঈমান ও ইসলামের সূত্রে একতাবদ্ধ থাকা। ঐক্যের ভিত্তি হবে তাওহীদ। তাওহীদ ত্যাগ করে এবং দ্বীনের মূলনীতি বিসর্জন দিয়ে কোনোরূপ ঐক্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ তা করলে সে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাওহীদ ও ইত্তিহাদ দুটোই তার হাতছাড়া হয়।

وأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। পরস্পর বিবাদ করো না তাহলে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।-সূরা আনফাল (৮): ৪৬

এ আয়াতে 'তাওহীদ ফিততাশরী' তথা একমাত্র আল্লাহকেই বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করার আদেশ আছে। শর্তহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর রাসূলের। অন্য সকলের আনুগত্য এ আনুগত্যের অধীন। সাথে সাথে কলহবিবাদ থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে এবং এর বড় দুটি কুফল সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে: এক. এর দ্বারা উম্মাহ শক্তিহীন হয়ে পড়বে, দুই. তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি লোপ পাবে।

# ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব

ইসলাম তাওহীদের দ্বীন এবং ঐক্যের ধর্ম। এখানে শিরকের সুযোগ নেই এবং অনৈক্য ও বিভেদের অবকাশ নেই। ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ-এক আল্লাহর ইবাদত, এক আল্লাহর ভয়।

এই তাওহীদের সমাজকে ইসলাম আদেশ করে সীরাতে মুস্তাকীম ও সাবীলুল মুমিনীনের উপর একতাবদ্ধ থাকার, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করার, ইজমা ও সাবীলুল মুমিনীনের বিরোধিতা পরিহার করার এবং এমন সব কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার, যা উম্মাহর একতা নষ্ট করে এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।

সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কুফর এবং পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ।

কথাগুলো যদিও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত আকীদা তবুও পুনস্মরণের
স্বার্থে কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

(এ প্রসঙ্গে মূল প্রবন্ধে আটটি সূরার সর্বমোট ২৭টি আয়াত রয়েছে। এখানে আরবী পাঠ ও তরজমাসহ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

(তরজমা) 'নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (তবে) সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে।-সূরাতুল আম্বিয়া (২১) : ৯২-৯৩

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ

(তরজমা) 'নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি

তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় কর। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক দল (নিজেদের খেয়ালখুশি মতো) যে পথ গ্রহণ করল তাতেই মত্ত রইল। সুতরাং (হে পয়গাম্বর!) তাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূর্খতায় ডুবে থাকতে দাও।-

সূরা মুমিনুন (২৩): ৫২-৫৩

উপরের দোনো জায়গায় নবীগণ যে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে উম্মত একটিই। আর তা হচ্ছে তাওহীদের উম্মত। সূরা ইউনুস (১০: ১৯) ও সূরা বাকারায় (২: ২১৩) বলা হয়েছে যে, আদিতে সকল মানুষ এ সমাজেই ছিল। পরে লোকেরা কুফর ও শিরক অবলম্বন করে আলাদা উম্মত, আলাদা সমাজ বানিয়ে নিয়েছে।

তাই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদ। تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُم )তারা) নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে) বাক্যে আকীদায়ে তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক ও অকাট্য আকীদা ও বিধানসমূহ (জরুরিয়াতে দ্বীনের) অস্বীকার বা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আলাদা মিল্লাত ও আলাদা উম্মত সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে।

# বিভেদের অবকাশ ও আল্লাহর হিকমত

ইসলামের সঠিক পথ নির্ধারণে বিভেদের অবকাশ রয়েছে নিঃসন্দেহে। যদি আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করতেন তবে সমস্ত মানব সমাজকে ইসলামী জীবন যাপনে বাধ্য করতে পারতেন, সে অবস্থায় পৃথিবীতে কেবল আল্লাহরই বন্দেগী থাকতো।

যেমন, প্রকৃতির অপরাপর সৃষ্টিকূল স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই আল্লাহর আইন মেনে চলে।

কোরআনে যেমন এরশাদ হয়েছে:-

- والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الآله الخلق والامر تبارك الله رب العلمين

(اعراف)

(চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাজী আল্লাহর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত, তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নির্দেশও অবশ্য পালনীয়, বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভূরই সব অনুগ্রহ।)

و له من في السموات والارض كل له قانتون - )البقرة(

(আসমান ও যমিনের সব কিছুর মালিকানা তারই, সবকিছুই তার কাছে অবনত।)

و لو شاء الله لهدا كم أجمعين - )النحل )٩(

(যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দিতেন)

অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহর এই সৃষ্টি স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তার নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই।

হযরত আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহর ফিরিস্তারাও এই কথাই বলেছিলেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানুষকেই হক ও বাতিলের মধ্যে নির্বাচন করতে

হবে, তাদেরকেই জীবন পথ নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ এ'ভাবে মানুষের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চান;

انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا - )الدهر(

(আমি তাদের পথ নির্দেশ করেছি, অতঃপর (তাদের স্বাধীনতা রয়েছে) তারা হিদায়াতের পথ গ্রহন করবে বা কুফুরির পথ বেছে নেবে)

তাদের এই স্বাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের উপরই তাদেব বিচার করা হবে। কাজের স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের বিচার করা আল্লাহর নিকট ইনসাফের পরিপন্থি।

و على الله قصد السبيل و منها جائر - )النحل )٩(

(আল্লাহ সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন, (পক্ষান্তরে) আবার অনেক বক্র পথও রয়েছে)

এই সোজা পথ প্রাপ্তি মানুষের সুকৃতি ও আল্লাহর অনুগ্রহের উপরই নির্ভর

করে। আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির জন্যে কোরআনে মজিদে দোয়া ও শিখিয়েছেন সুরা ফাতিহায়।

إهدنا الصراط المستقيم - )الفاتحة(

(হে আল্লাহ, আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করুন)

সুরা হুদের নিচের আয়াতে বিষয় বস্তুকে আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছে;

و لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و لا يزالون مختلفين - الا من رحم ربك لذلك خلقهم

(هود) -

(যদি তোমাদের রব ইচ্ছা করতেন, তবে সমস্ত মানব সন্তানকে এক অখন্ডিত উম্মাহয় পরিণত করতেন। (কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়, তাই) তোমরা বিভেদে লিপ্ত থাকবে। (অর্থাৎ তোমাদের স্বাধীন চিন্তার ফয়সালা এই বিভেদের কারণ হবে। এই বিভেদের বিষফল থেকে বেঁচে থাকবে

তারাই) যারা তাদের কর্ম প্রচেষ্টায় আল্লাহর অনুগ্রহের যোগ্য হবে। (অতঃপর মানব গোষ্ঠীকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে বিভেদের অবকাশ রেখেই) তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামে বিভেদের অবকাশ রয়েছে। এই অবকাশ কোন বৈধতার সনদ নয়, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের ঈমানী শক্তির পরীক্ষা করেন। আল্লাহর কাছে মানুষের ঐক্যই কাম্য। অবাঞ্ছিত বিভেদে না গিয়ে ঐক্যের পথে সমবেত হতে আদম সন্তানদের প্রতি কোরআনে মজিদ ও নবী মোস্তফা (সঃ) উদ্দত আহবান জানিয়েছেন এবং বিভেদের পথ থেকে সরে থাকার জন্য সর্তক করে দিয়েছেন বার বার।

# বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মার অবস্থা

একসময় মুসলিম উম্মাহ ছিল জ্ঞান, ন্যায়বিচার ও সভ্যতার প্রতীক। আল্লাহর পথের দাওয়াত ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে তারা নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু আজকের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। উম্মাহর রক্ত আজ পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় ঝরছে।

১. ফিলিস্তিন: উম্মাহর ওপরে ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘতম জুলুম

**ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট**

১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—সবই ছিল মুসলিম ভূখণ্ড দখলের পশ্চিমা পরিকল্পনার অংশ। ইহুদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ একযোগে একে কার্যকর করে।

**গাজা: রক্তের সমুদ্র**

২০২৩–২৪ সালের গাজা যুদ্ধ এই দখলের নিষ্ঠুরতাকে চরম মাত্রায় নিয়ে যায়। ৩০,০০০-এর বেশি শহীদ, যাদের সিংহভাগই নারী ও শিশু। হাজার হাজার ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল ও মসজিদ ধ্বংস করা হয়। জাতিসংঘ স্বীকার করে—“গাজা আর বাসযোগ্য নয়”।

**আল-আকসা ও উম্মাহর দায়িত্ব**

আল-আকসা মুসলিম উম্মাহর তৃতীয় পবিত্র স্থান। অথচ প্রায় প্রতিদিন সেটিতে হামলা হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

> "মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের এক অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন..."
(সূরা ইসরা: ১)

এই মসজিদের হেফাজতের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর কাঁধে। কিন্তু আজ আমরা কেবল প্রার্থনা ও বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করি।

২. চীনে উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ‘শুদ্ধি অভিযান’

জিনজিয়াং অঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ মুসলমান বন্দিশিবিরে নির্যাতনের শিকার। ইসলামি পোশাক, নামাজ, রোজা, কুরআন রাখা—সবই অপরাধ। নারীদের জোর করে চীনা পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। শিশুরা আলাদা করে রাখা হয় যাতে তারা ইসলাম না শিখতে পারে।

**একটি ‘নীরব গণহত্যা’**

পশ্চিমা মিডিয়া ও মুসলিম সরকারগুলো অধিকাংশই এই বিষয়ে নীরব, যেন এটি কোনো বিষয়ই নয়।

৩. রোহিঙ্গা: জাতিগত নিধনের শিকার

২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যায় হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হন। লাখো মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। নারীরা ধর্ষিত হন, শিশুদের পুড়িয়ে মারা হয়। জাতিসংঘ একে “জাতিগত নিধন” ঘোষণা করেছে, তবুও বিচার নেই।

৪. ভারতের মুসলমান: সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদের শিকার

**কাশ্মীর: কারফিউর জনপদ**

৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়েছে। ইন্টারনেট বন্ধ, গ্রেফতার, গুম—সবই নিত্যদিনের ঘটনা।

হিন্দু চরমপন্থা ও মুসলমানদের অধিকার হরণ

CAA, NRC, হিজাব নিষিদ্ধকরণ, লিনচিং ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের নাগরিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। মসজিদ ভেঙে মন্দির বানানোর পরিকল্পনা খোলামেলাভাবেই চলছে।

৫. ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়া

মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ, মসজিদে আগুন, কুরআন পোড়ানো, রাসুল সা.-কে কটাক্ষ—সবই ইসলামবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে ‘দমন’ নীতিতে রূপান্তর

ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন, আমেরিকা—সবখানেই “অভ্যন্তরীণ শত্রু” হিসেবে মুসলমানদের দেখা হচ্ছে। ইসলামি চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে মিডিয়া, শিক্ষা ও রাজনীতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব: আত্মপরীক্ষার সময়

কুরআন বলছে:

> “আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে।”
(সূরা রা'দ: ১১)

হাদিস বলছে:

> "যখন তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসবে, আর মৃত্যুকে ভয় পাবে, তখন আল্লাহ শত্রুদের তোমাদের ওপর বিজয়ী করবেন।”
(আবু দাউদ)

উম্মাহর পরাজয় বাহ্যিক নয়, বরং আত্মিক দুর্বলতার ফল।

৭. মুসলিম নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও খিলাফতের অনুপস্থিতি

**খিলাফতের বিলুপ্তি: ১৯২৪**

উসমানী খিলাফতের পতনের পর মুসলমানরা জাতিগত, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একতার শক্তি হারায়।

## বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা

বেশিরভাগ মুসলিম রাষ্ট্র পশ্চিমা নীতি ও আগ্রাসনকে রক্ষা করছে। পেট্রোডলার, রাজতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদ—সবই ইসলামী নেতৃত্বের বিকল্প নয়।

৮. উম্মাহর বিভাজনের মূল কারণসমূহ

১. জাতীয়তাবাদ

২. মাযহাব ও দলীয় সংকীর্ণতা

৩. ইসলামি শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি

৪. পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

৫. উম্মাহর প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব

## ১.মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক ঐক্য–

ইতিহাসের পাতায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্য একটি শক্তিশালী ও গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। ইসলামের সূচনালগ্নেই এই ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন তিনি শুধু একটি ধর্মীয় বার্তাই দেননি, বরং একটি সম্প্রদায়, একটি উম্মাহ গঠনের আহ্বান জানান।

মদিনায় হিজরতের পর রাসূল (সা.) 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন, যা ছিল একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান। এতে শুধু মুসলিমদের নয়, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য গোত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে একটি সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সনদ মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফতের যুগে (খুলাফায়ে রাশেদীন) ঐক্য বজায় রাখা হয়েছিল পারস্পরিক পরামর্শ, ন্যায়বিচার, ও ইসলামী মূল্যবোধের মাধ্যমে। হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.)—প্রত্যেকেই উম্মাহর ঐক্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং পরবর্তীকালে উসমানীয় খিলাফতের অধীনে মুসলিমরা একক নেতৃত্বের ছায়ায় ছিল। এই সময় মুসলিম সভ্যতা শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও প্রশাসনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। একক নেতৃত্ব ও ইসলামী আদর্শভিত্তিক শাসনের কারণেই এই ঐক্য এতদিন টিকে ছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই ঐক্য কিছু ধাপে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিভাজন, গোষ্ঠীগত স্বার্থ, জাতীয়তাবাদ, এবং ধর্মীয় মতপার্থক্য ঐক্যের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৪ সালে ইসলখিলাফতের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ঐ ঐতিহাসিক ঐক্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

তবুও, ইতিহাস প্রমাণ করে মুসলিম উম্মাহ যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন তারা বিশ্বের অগ্রণী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সামরিক শক্তি, এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসন বিশ্বের জন্য উদাহরণস্বরূপ ছিল।

## ২.ইসলামের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম, শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতার উন্নতির জন্য নীতিমালা প্রদান করে। ইসলামের সামাজিক কাঠামো অত্যন্ত সমানুভূতিশীল এবং মানবাধিকার, ন্যায়, সমতা ও ভাইচারা প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত। ইসলামের প্রতি সাধারণ ধারণা, একমাত্র আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, এর সামাজিক দিকটি কখনোই উপেক্ষিত হয়নি।

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের বার্তা দেয়। প্রথমে এটি আরব সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যেখানে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু ইসলামের আগমন মানুষকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ দিলো, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্যগুলি আর কোনো ভিন্নতা বা অগ্রাধিকার পায়নি। কুরআনের সূরা আল-হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে,

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চেনো।" (সূরা আল-হুজুরাত 49:13)। এই আয়াত স্পষ্টভাবে সামাজিক ঐক্যের মর্মার্থ বুঝিয়ে দেয়।

এছাড়াও, ইসলামে সামাজিক ঐক্য রক্ষার জন্য প্রচুর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজে, ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা, শাসক-প্রজার মধ্যে কোনো বৈষম্য নয়, বরং পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমদের মধ্যে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল মদিনার সনদে, যেখানে মদিনায় বসবাসরত মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে একত্রে একটি সমাজে পরিণত করা হয়েছিল। এই ঐক্য যে শুধু ধর্মীয় ভিত্তিতে ছিল না, তা প্রমাণিত হয় মদিনার সংবিধানে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না, বরং এর ভিত্তি হলো মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতা। রাসূল (সা.)-এর জীবনে উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত মদিনার সমাজ ছিল, যেখানে মুসলিমরা একে অপরকে সাহায্য করত এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল ছিল। এভাবেই ইসলামের সামাজিক কাঠামো সবার জন্য একধরনের সমতা ও নিরাপত্তা প্রদান করে।

যদিও ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মুসলিম সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ঐক্যকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মুসলিম সমাজে ক্রমবর্ধমান জাতি, গোত্র এবং ধর্মীয় বিভেদ এসব চ্যালেঞ্জের কিছু বড় কারণ। বিশেষ করে আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে ভঙ্গুর করে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামে একীভূত মুসলিম সমাজের ধারণা কখনো হারিয়ে যায়নি।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু মুসলিমদের মধ্যে নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য একটি শক্তিশালী মেসেজ হিসেবে বিদ্যমান। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য শুধু তাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং পৃথিবীর শান্তি এবং মানবতার উন্নতির জন্যও অত্যন্ত জরুরি। কুরআন এবং হাদিসে বারবার বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। "তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো ন্যায়ের ব্যাপারে এবং আল্লাহর ভয়ভীতি থেকে" (সূরা আল-মায়িদা 5:2)। এটি একটি সার্বজনীন মন্ত্র, যা মুসলিম সমাজকে শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, বরং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেও সাহায্য করবে।

বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যেও মুসলিমদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রবল। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দারিদ্র্য এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিভক্তি এবং অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য যদি পুনরুদ্ধার করা যায়, তবে তা কেবল মুসলিমদের মধ্যেই শান্তি আনার পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্ক উন্নতিতে সহায়ক হবে।

**৩.রাজনৈতিক ঐক্যের প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ–**

রাজনৈতিক ঐক্য একটি জাতির বা সম্প্রদায়ের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি কেবল একটি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখে না, বরং বাইরের শক্তির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সুনির্দিষ্ট অবস্থান তৈরি করে। মুসলিম উম্মাহর জন্য রাজনৈতিক ঐক্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, কারণ ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে মুসলিমদের একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে তারা মহান শাসনব্যবস্থা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে, এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা সবসময় সহজ ছিল না এবং আজকের দিনে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

১. ইসলামী ঐক্য ও রাজনৈতিক ঐক্য

ইসলাম প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মডেল প্রদান করেছে। রাসূল (সা.) এর জীবনযাপন ও তাঁর শাসনব্যবস্থা, বিশেষত মদিনার সনদ, মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক ঐক্যের একটি আদর্শ স্থাপন করেছে। মদিনার সনদে আলাদা আলাদা গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এতে রাজনৈতিক ঐক্যের এক মহান উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে প্রতিটি জনগণকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল।

এই ঐক্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একটি সুসংহত সমাজ তৈরি হয়, যা ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তবে, ইসলামের এই রাজনৈতিক ঐক্য শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার অংশ ছিল। এর মাধ্যমে, মুসলিমরা একত্রিত হয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করার পাশাপাশি সমাজের শাসন, আইন ও সংস্কৃতি নিয়েও মতামত একত্রিত করতে পারত।

২. রাজনৈতিক ঐক্যের প্রভাব

রাজনৈতিক ঐক্য মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমত, এটি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সমাধানে সহায়ক হয়। ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামো মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ঐক্য না থাকলে, প্রতিটি রাষ্ট্র আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় এবং একে অপরের সাথে সহযোগিতা কম হয়।

রাজনৈতিক ঐক্য মুসলিম উম্মাহকে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি দৃঢ় অবস্থান প্রদান করে। যদি মুসলিম দেশগুলো একত্রিত হয়, তারা আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজেদের মতামত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারবে এবং বৃহত্তর শক্তির সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে। যেমন, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স, ট্রেড, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। এছাড়া, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য তাঁদের শক্তি আরও শক্তিশালী করবে, যা একসময় তাদের নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সহায়ক হবে।

৩. রাজনৈতিক ঐক্যের চ্যালেঞ্জ

ইসলামী ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন কিছু সময় সফল হলেও, তা স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রায়ই ভেঙে পড়েছে।

প্রথমত, জাতীয়তাবাদ ও অঞ্চলীয় বৈষম্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কের জন্য জাতীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে একীকরণের ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। মিশরের জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানের উগ্র ইসলামি রাজনীতি, সৌদি আরবের রাজতান্ত্রিক শাসন এবং ইরানের শিয়া ইসলামী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গভীর বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় বিভেদ ও মতপার্থক্য রাজনৈতিক ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্নি ও শিয়া মুসলিমদের মধ্যে একীভূত মতাদর্শ না থাকা, প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, পাকিস্তান ও ইরাকের মতো দেশে এই ধর্মীয় বিভক্তি রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়ত, বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের ঔপনিবেশিক নীতি এবং বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আস্থা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন শক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ও তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক দখল করতে চেষ্টা করছে।

তাছাড়া, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক বৈষম্যও মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা। কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন লক্ষ্যে কাজ করা হলেও, অন্যদিকে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে রয়েছে। এই পরিস্থিতি ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহত্তর রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

৪. সমাধান ও সুপারিশ

মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শিক্ষা, ইসলামি ঐতিহ্য এবং সাধারণ মূল্যবোধগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য এবং সহযোগিতার জন্য ইমামদের, আলেমদের এবং ইসলামী চিন্তকদের একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় বিভেদকে অতিক্রম করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবার স্বার্থকে সম্মান দিয়ে একটি সম্মিলিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে।

তৃতীয়ত, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। যেমন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংহতি স্থাপন এবং মুসলিম দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহায়তা বৃদ্ধি করা।

এভাবে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হতে পারে, তবে এটি মানবতার কল্যাণ এবং মুসলিম বিশ্বের শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## ৪. মুসলিম উম্মার ঐক্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ইসলামী দৃষ্টিকোণে একটি অপরিহার্য বিষয়। এটি শুধু একটি ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, বরং মুসলিমদের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা, ও অগ্রগতির প্রধান চাবিকাঠি। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো—সব মুসলমান এক কায়দায়, এক দিশায় চলবে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

ক. কুরআনের আলোকে ঐক্যের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বারবার মুসলিমদের একতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।"
— সূরা আলে ইমরান (৩:১০৩)

এই আয়াতটি মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি রচনা করে। আল্লাহর রজ্জু বলতে কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ বোঝানো হয়েছে, যা মুসলিমদের জীবনচলার একমাত্র নির্দেশনা। বিভাজন আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ এবং দুর্বলতার সূচক।

খ. হাদীসের দৃষ্টিকোণে ঐক্য

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"
"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ভবনের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্ত করে ধরে রাখে।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৮১

এই হাদীস মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও একতাবদ্ধতার গুরুত্ব বোঝায়।

গ. ঐক্যের অভাবের পরিণাম

ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলিমরা যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন তারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে—খিলাফত রাশিদা, উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানীয় আমল তার উদাহরণ। কিন্তু মুসলিমরা যখন বিভক্ত হয়েছে, তখন তারা কেবল রাজনৈতিকভাবে নয়, বরং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্রুসেড যুদ্ধ, মঙ্গোল আক্রমণ, আধুনিক উপনিবেশবাদ সবই এই বিভক্তির সুযোগ নিয়েছে।

ঘ. সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ঐক্যের প্রয়োজন

বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক সীমারেখা, মতবাদগত বিভাজন, ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ঐক্য রক্ষার বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর কিংবা রোহিঙ্গা সংকটের মতো ঘটনাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মুসলিম উম্মাহর যদি একটি ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ থাকতো, তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের দাবিকে অবহেলা করা যেত না।

মোটকথা, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য শুধু একটি ধর্মীয় আদর্শ নয়, বরং এটি একটি বাস্তব রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন। ইসলাম শান্তি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, আর ঐক্যই সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেয়।

**৫.ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও উম্মাহর ঐক্য-**

ইসলামী শাসনব্যবস্থা এমন একটি বিস্তৃত সমাজবিন্যাস যা কেবল রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থা কেবল ব্যক্তিক নয়, বরং একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূলনীতি
ইসলামী শাসনব্যবস্থা চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. তাওহীদ (ঐক্যের দর্শন): ইসলামে আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এটি উম্মাহর মধ্যে বিভাজনের পরিবর্তে ঐক্যকে উৎসাহিত করে (সূরা আল-ইমরান, 3:103)।

২. শূরা (পরামর্শভিত্তিক শাসন): ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্ব পায়। কুরআনে বলা হয়েছে: "তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শে পরিচালিত হয়" (সূরা আশ-শূরা, 42:38)।

৩. ইনসাফ (ন্যায়বিচার): ইসলামী শাসনব্যবস্থা সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে, মুসলিম হোক বা অমুসলিম। আল কুরআন বলে: “আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন ন্যায় ও সৎ ব্যবহারের” (সূরা আন-নাহল, 16:90)।

৪. খিলাফাহ ও নেতৃত্ব: ইসলামে নেতৃত্ব একটি দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “প্রত্যেকেই একজন রাখাল, এবং সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে” (সহিহ বুখারি, হাদীস ৮৯৩)।

উম্মাহর ঐক্যের সঙ্গে ইসলামী শাসনব্যবস্থার সম্পর্ক

ইসলামী শাসনব্যবস্থা উম্মাহর ঐক্য রক্ষার একটি কার্যকর পদ্ধতি। ইতিহাসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনায় বা খিলাফায়ে রাশেদার শাসনে মুসলিম সমাজে একতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল সুদৃঢ়। যখন ইসলামী আদর্শ থেকে সরে গিয়ে জাতিগত, বংশগত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হলো, তখনই উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইতিহাস থেকে প্রমাণ

খিলাফায়ে রাশেদা যুগে (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) মুসলিমরা একটি নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই সময়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ-ভিত্তিক। কিন্তু খিলাফাহ ভেঙে যাওয়ার পর রাজনৈতিক বিভাজন, উপনিবেশবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উম্মাহর ঐক্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সূত্র: Abu Ala Maududi, Political Theory of Islam, 1941)।

আধুনিক পরিপ্রেক্ষিত

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে বহু রাষ্ট্র থাকলেও ইসলামী শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত রাজনীতি উম্মাহর ঐক্যকে দুর্বল করে তুলেছে। ওআইসি (OIC) এর মত প্রতিষ্ঠান থাকলেও তা কার্যকর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হলে ইসলামী আদর্শ, নেতৃত্বের স্বচ্ছতা এবং পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন করতে হবে।

ইসলামী শাসনব্যবস্থা শুধু একটি শাসনপদ্ধতি নয়, এটি উম্মাহর ঐক্য ও নৈতিক পুনর্জাগরণের রূপরেখা। ইসলামের মূলনীতিতে প্রত্যাবর্তন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ আবার ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

## ৬.মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্য পদ্ধতি ও সুপারিশ

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহ একসময় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল তাদের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠ সামাজিক কাঠামোর জন্য। কিন্তু সময়ের প্রবাহে বিভেদ, মতবিরোধ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিদেশি প্রভাব মুসলিম সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছে। আজকের বাস্তবতায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্য কেবল একটি ধর্মীয় দাবি নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয়তা। এই ঐক্য পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক কার্যকর পদ্ধতি এবং সুসংহত সুপারিশ।

**ঐক্য রক্ষার কার্যকর পদ্ধতি**

১. কুরআন ও সুন্নাহকে কেন্দ্রীয় সূত্র হিসেবে গ্রহণ
মুসলিম উম্মাহর সকল মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে মান্য করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি লুপ্ত হয়ে যাবে" (সূরা আল-আনফাল, ৮:৪৬)।
এই আয়াত স্পষ্টভাবে ঐক্যের গুরুত্ব ও বিভেদের ক্ষতি তুলে ধরে।

২. পারস্পরিক সহনশীলতা ও দাওয়াতের সংস্কৃতি গঠন
উম্মাহর মধ্যে ভিন্নমত থাকবেই, কিন্তু তা যেন বিবাদের রূপ না নেয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে: "তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে" (সূরা নাহল, ১৬:১২৫)।
বিভিন্ন মাজহাব ও চিন্তাধারার অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান এবং ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করতে হবে।

৩. নেতৃত্বে যোগ্যতা ও একতা নিশ্চিত করা
মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের সংকট ঐক্যহীনতার অন্যতম কারণ। নেতৃত্বে ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিকতা এবং জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব উম্মাহকে একটি লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

৪. শিক্ষা ও সচেতনতাভিত্তিক কার্যক্রম বৃদ্ধি
ঐক্যের বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। ঐতিহাসিক বিভাজনের কারণ, ইসলামি ঐক্যের সুফল ও আজকের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

৫. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতির চেষ্টা
ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা দরকার। সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ঐক্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

গঠনমূলক সুপারিশসমূহ

১. বিশ্বব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামি প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা

মাজহাব-নিরপেক্ষ, নীতিনিষ্ঠ ও প্রতিনিধিত্বশীল একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী পরিষদ গঠন করা যেতে পারে, যারা মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

২. শিক্ষা পাঠ্যক্রমে উম্মাহর ঐক্য বিষয়ে অধ্যায় সংযোজন
প্রতিটি মুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব, ইতিহাস এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৩. ইন্টার-মাজহাব সংলাপ ও সম্মেলন আয়োজন
সুন্নি, শিয়া এবং অন্যান্য মাজহাবভিত্তিক দলসমূহের মধ্যে সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি নিরসন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে হবে।

৪. দাওয়াতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি
উম্মাহর অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার মাধ্যমে ঐক্যবোধকে তীব্রতর করা সম্ভব। সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র ও মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

৫. ধনী মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি
অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে দরিদ্র ও যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম জাতিগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে। এটি কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং ঐক্যের প্রতীকও বটে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মুসলিমের চেতনায় একটি জাগ্রত প্রশ্ন। এই ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেবল ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং এটি হলো একটি কৌশলগত ও নৈতিক দায়িত্ব। ঐক্য রক্ষার জন্য আমাদের দরকার সৎ নেতৃত্ব, সহনশীলতা, শিক্ষা ও পারস্পরিক সহযোগিতা। ইতিহাসের আলোকে, বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জই থাকুক না কেন, ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্য পুনর্গঠন সম্ভব।

## 7.উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় নেতৃত্বের ভূমিকা

ভূমিকা
ইসলামে ধর্মীয় নেতৃত্ব (উলামা, মুফতি, ইমাম, ও ইসলামী চিন্তাবিদ) বরাবরই সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বিভ্রান্তি কিংবা মতভেদপূর্ণ সংকটে যখন মুসলিম সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন ধর্মীয় নেতৃত্বই

উম্মাহকে সঠিক পথ দেখিয়েছে। বর্তমান সময়ে যখন মুসলিম উম্মাহ নানাভাবে বিভক্ত, তখন ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এসব নেতৃত্বের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১. সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উম্মাহকে ঐক্যের পথ দেখাতে পারেন।
আল্লাহ বলেন:
"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতানৈক্যে পড়ো, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও" (সূরা নিসা, ৪:৫৯)।
উলামাদের কাজ হলো মানুষের বিভ্রান্তি দূর করে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা, যাতে ভ্রান্ত মত বা চরমপন্থা সমাজে ঠাঁই না পায়।

২. মাজহাবভিত্তিক বিভেদের সমাধানে উদ্যোগ

বিভিন্ন মাজহাব বা মতভেদ মুসলিম সমাজে একটি বাস্তবতা। কিন্তু এগুলো যেন দ্বন্দ্বের রূপ না নেয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ধর্মীয় নেতৃত্বের।
ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি বলেন, "মাজহাব ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা মূল ধর্মীয় বিধান ও ঐক্যের স্বার্থে একত্র হতে পারি, তবে উম্মাহর বিভক্তি দূর হবে।"
এই কাজের জন্য প্রয়োজন উলামাদের মধ্যে আন্তঃমাজহাব সংলাপ এবং সম্মিলিত দাওয়াতি উদ্যোগ।

৩. সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা

ধর্মীয় নেতারা যখন সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তখন অনুসারীরাও তা গ্রহণ করে।
রাসূল (সা.) বলেন, "একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে অপমান করে না।" (সহিহ বুখারী, হাদীস ৬০৬৬)
ধর্মীয় নেতাদের উচিত জাতিগত, ভাষাগত বা গোষ্ঠীগত পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে সকল মুসলিমকে এক উম্মাহর চেতনায় একত্রিত করা।

৪. রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ ভূমিকা

ধর্মীয় নেতাদের উচিত রাজনৈতিক মতভেদে পক্ষপাতিত্ব না করে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।

ইসলামের প্রথম যুগে যেমন সাহাবিরা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি আজকের ধর্মীয় নেতৃত্বেরও উচিত সংলাপের মাধ্যমে সংঘাত নিরসন করা।

## ৮. বিশ্ব রাজনীতি ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

বিশ্ব রাজনীতি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্য, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম উম্মাহ একটি বড় অংশ হলেও, ঐক্য ও সংহতির অভাবে তারা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, পরাশক্তির হস্তক্ষেপ এবং নেতৃত্বহীনতা বিশ্ব রাজনীতিতে উম্মাহর ঐক্যকে দুর্বল করে তুলেছে। এই অধ্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, মুসলিম উম্মাহর অবস্থান এবং ঐক্যের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

১. বিশ্ব রাজনীতির কাঠামো ও মুসলিম উম্মাহর অবস্থান

আধুনিক বিশ্ব রাজনীতি গঠিত হয়েছে জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ, ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-৭, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফসহ পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। এসব আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব সীমিত। যদিও মুসলিম দেশগুলো ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন—তেল, গ্যাস, সমুদ্রবন্দর, কৌশলগত অবস্থান ইত্যাদি, তবুও ঐক্যের অভাবে তারা বিশ্ব রাজনীতিতে কোনো সমন্বিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না।

২. ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও মুসলিম বিভাজন

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম অঞ্চলগুলোকে কৌশলগতভাবে বিভক্ত করেছিল—যেমন, সাইক্স-পিকো চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। আজও সেই কৃত্রিম সীমান্ত, জাতীয়তাবাদ ও ভাষাগত বিভাজন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও শত্রুতার জন্ম দিয়েছে। ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, যেমন সৌদি-ইরান, কাতার-আরব ব্লক বা তুরস্ক-মিসর বিরোধ।

৩. বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম উম্মাহর দুর্বল ভূমিকা

ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়া, ইয়েমেন কিংবা রোহিঙ্গা সংকটে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান খুবই দুর্বল। বিশ্ব রাজনীতি এসব সংকটে পরাশক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করে, অথচ মুসলিম দেশগুলোর কণ্ঠস্বর দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ। জাতিসংঘে কোনো মুসলিম দেশ ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। তদুপরি, অর্থনৈতিক ও সামরিক নির্ভরতা মুসলিম দেশগুলোকে স্বাধীনভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে বাধা দিচ্ছে।

৪. ইসলামি সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) এবং আরব লীগ বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও তারা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও পরনির্ভরশীল। ফিলিস্তিন ইস্যুতে একযোগে চাপ সৃষ্টি কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম দেশগুলোতে সহায়তার ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলোর কার্যকর ভূমিকা নেই। এর ফলে মুসলিম জনগণ এই সংস্থাগুলোর ওপর আস্থা হারাচ্ছে

৫. বিশ্ব রাজনীতি ও ইসলামভীতি

বিশ্ব রাজনীতিতে ইসলামকে প্রায়ই হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, কূটনৈতিক নীতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কৌশলে 'সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলাম' শব্দজোড়ার ব্যবহার মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক নজরদারি মুসলিম বিশ্বের ওপর এক ধরণের বৈশ্বিক চাপ সৃষ্টি করে, যা ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে একটি মনস্তাত্ত্বিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৬. উত্তরণের পথ: রাজনৈতিক ঐক্য গঠনের কৌশল

বিশ্ব রাজনীতিতে সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা অপরিহার্য। এজন্য দরকার:

কূটনৈতিক ঐক্য: মুসলিম দেশগুলোর উচিত আন্তর্জাতিক ইস্যুতে অভিন্ন নীতি গ্রহণ।

অর্থনৈতিক জোট: মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মাঝে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে হবে, যেমন ইসলামি অর্থনীতি ও হালাল বাণিজ্য প্রসারে সম্মিলিত পদক্ষেপ।

সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম: মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলে বিশ্বকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সত্যিকারের বার্তা পৌঁছাতে হবে।

শিক্ষা ও গবেষণা: বিশ্ব রাজনীতির জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরি করতে হলে ইসলামি রাজনীতি ও কূটনৈতিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে ঐক্য এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

কুরআন ও হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে:

> "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"মুসলিমরা এক দেহের মতো; এক অঙ্গে আঘাত লাগলে পুরো শরীর তার ব্যথা অনুভব করে।"
(সহিহ বুখারি, হাদীস: ৬০১১)

এমন নীতিমালার আলোকে মুসলিম দেশগুলোর উচিত বিশ্ব রাজনীতিতে একটি সম্মিলিত নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান গড়ে তোলা।

বিশ্ব রাজনীতি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিঘ্নিত করার জন্য একটি সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে। তবে এই প্রেক্ষাপটেই মুসলিমদের উচিত নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন ভুলে গিয়ে কৌশলগত ঐক্য গড়ে তোলা। ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং জ্ঞান, অর্থনীতি ও নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এমন এক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে হবে, যা বিশ্ব রাজনীতিতে সম্মানজনক ও প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

**৯.মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধতা এবং আধুনিক যুগের সমস্যাসমূহ–**

মুসলিম উম্মাহ, যা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে গঠিত একটি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তা, দীর্ঘকাল ধরে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যর অভাব আধুনিক যুগে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেখানে বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক বিভাজন মুসলিম জাতিকে একত্রিত হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অধ্যায়ে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধতা এবং আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে, যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

১. ঐক্যবদ্ধতার অভাবের কারণে বর্তমান সমস্যাসমূহ

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যহীনতা আধুনিক যুগে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বিভাজন, অস্থিরতা এবং বিরোধের ফলে ঐক্যের

অভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। যেমন, সৌদি আরব ও ইরান, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া ইত্যাদি দেশগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধগুলো উম্মাহর ঐক্যের অভাবকে আরও স্পষ্ট করেছে।

এছাড়া, বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যহীনতার কারণে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে দুর্বলতা দেখা দেয়। মুসলিম দেশগুলো বিশ্বব্যাপী আলোচনাগুলোর ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য একটি সমন্বিত এবং শক্তিশালী কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলস্বরূপ, মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কার্যকর কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

২. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জসমূহ

আধুনিক যুগে মুসলিম উম্মাহকে কয়েকটি বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেগুলো ঐক্যবদ্ধতার অভাবের কারণে আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

(ক) পরাশক্তির প্রভাব

বিশ্ব রাজনীতির বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, এবং ইউরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক কৌশল মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। কূটনৈতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক শাস্তি, সামরিক হস্তক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক চাপের মাধ্যমে এসব রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যেহেতু একত্রিত হয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়তে পারছে না, তারা বিশ্বের রাজনীতিতে নিজস্ব অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

(খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিশাল অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে। কিছু মুসলিম রাষ্ট্র তেল, গ্যাস, এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, যেমন সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অন্যদিকে বেশ কিছু মুসলিম দেশ রয়েছে যেগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল এবং মানবিক সংকটের মধ্যে বাস করছে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

(গ) সামাজিক ও ধর্মীয় বিভাজন

মুসলিম বিশ্বে শিয়া-সুন্নি, আধুনিকবাদী-রক্ষণশীলসহ নানা ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজন বিদ্যমান। এসব বিভাজন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। ঐক্যহীনতার কারণে, মুসলিম দেশগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, এবং বরং এসব বিভাজন বিশ্ব রাজনীতির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(ঘ) শিক্ষা এবং তথ্যের অভাব

অপর্যাপ্ত শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির অভাবও মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা, যা মুসলিম দেশগুলোর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

৩. আধুনিক যুগে ঐক্যবদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য উপায়

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি:

পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন মুসলিম দেশদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নীতি সংহতি: মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হতে হবে। বিশেষ করে, জাতিসংঘ, আরব লীগ, ওআইসি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সমন্বিত কূটনীতি অনুসরণ করতে হবে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি: ধর্মীয় বিভাজন কমিয়ে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের ঐক্যের মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং মুসলিমদের মধ্যে একে অপরকে সহায়তা করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

অর্থনৈতিক জোট: মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্লক গঠন করতে হবে। এটি তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, কৃষি এবং প্রযুক্তির খাতে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে উম্মাহর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সৃষ্টি করবে।

মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধতা আধুনিক যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা তাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্ত করছে। তবে, যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয় এবং ধর্মীয় বিভাজন কমায়, তবে তারা বিশ্ব রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা সারা বিশ্বের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধির ভিত্তি হতে পারে।

**১০.মুসলিম উম্মাহর ঐক্য: ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ–**

মুসলিম উম্মাহ, যেটি একটি বৈশ্বিক সম্প্রদায় হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের ঐক্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, দীর্ঘকাল ধরেই ঐক্যবদ্ধতার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমান যুগে, যখন বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, এবং সমাজের ধারা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। তবে, এই সংকটের মধ্যেও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। এই অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং তার জন্য সামনে থাকা প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা হবে।

১. ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভবিষ্যতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন দিক থেকে শক্তিশালী হতে পারে।

(ক) বৈশ্বিক ইসলামি সংহতি

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইসলামী ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির পাঠক্রমের বিস্তার এবং সেসব স্থানে মুসলিম ছাত্রদের একটি সমন্বিত সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রয়াস, ভবিষ্যতে একতা প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মুসলিম দেশগুলো যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তারা ঐক্য প্রতিষ্ঠার নতুন দিগন্তের দিকে এগোতে পারে।

(খ) মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক জোট

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট গঠন ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। বৈশ্বিক বাজারে অধিক শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে অপরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে নিজেদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এতে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, রাজনৈতিকভাবে একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তিশালী অবস্থান গড়া সম্ভব হবে।

(গ) ইসলামী মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ইসলামী আদর্শ এবং মূল্যবোধের ওপর পুনঃনির্ভরশীলতা ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ প্রশস্ত করতে পারে। ইসলাম সবসময় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা উম্মাহর অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে উৎসাহিত করতে পারে।

(ঘ) মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সমন্বয়

অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোলাবোরেশন (OIC) এবং অন্যান্য আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করা যেতে পারে। একটি সমন্বিত কূটনৈতিক অবস্থান মুসলিম দেশগুলোর জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব রাজনীতিতে একটি দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সহায়ক হতে পারে।

২. ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভবিষ্যতে কিছু সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এর জন্য একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে।

(ক) রাজনৈতিক অস্থিরতা

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বর্তমানে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, এবং আফগানিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে চলমান সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক বিভাজন ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথকে আরো কঠিন করে তুলছে। এই ধরনের

সংঘাত এবং অস্থিরতা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য গঠন এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করার সুযোগকে সীমিত করে দিয়েছে।

(খ) ধর্মীয় বিভাজন

শিয়া-সুন্নি বিভাজন, সালাফি-সুন্নি বিরোধ, এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিভাজন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই বিভাজন কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি করছে।

(গ) পশ্চিমা প্রভাব এবং আধিপত্য

পশ্চিমা শক্তির প্রভাব এবং আধিপত্য মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। পশ্চিমা দেশগুলোর বিভিন্ন কৌশল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে সহায়তা করছে, যা তাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা। পশ্চিমা শক্তির হস্তক্ষেপ মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করছে এবং তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

(ঘ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য অত্যন্ত তীব্র। কিছু দেশ যেমন সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত অত্যন্ত ধনী, অন্যদিকে বেশ কিছু দেশ যেমন পাকিস্তান, ইয়েমেন, এবং সোমালিয়া একেবারে দরিদ্র। এই বৈষম্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা একটি সময়সাপেক্ষ এবং জটিল প্রক্রিয়া, তবে ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন দূর করে এবং একটি একক কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে। সঠিক পরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। যদিও এটি কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিশ্চিত করা একটি বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

## ১১.মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অখণ্ডতা

মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী বিশ্বে আলোচিত হয়ে আসছে। মুসলিম দেশগুলো প্রথাগতভাবে ইসলামি মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন করার চেষ্টা করেছে। তবে, বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় বিভাজনের কারণে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতা হুমকির মুখে পড়েছে। এই প্রবন্ধে মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতার গুরুত্ব এবং তা রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১. মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ। একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব:

(ক) সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

মুসলিম দেশগুলো একটি অভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভাগ করে নিয়েছে। এই ঐক্য মুসলিম জাতিসত্তার মূল ভিত্তি, যা তাদের শক্তিশালী একটি বিশ্ব সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। ঐক্যবদ্ধতা তাদের মুসলিম জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদর্শগুলোকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করার সুযোগ দেয়।

(খ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

অভ্যন্তরীণ ঐক্য একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। যখন একটি দেশ অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত থাকে, তখন তা শত্রুদের জন্য দুর্বলতা সৃষ্টি করে এবং তারা দেশের রাজনৈতিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে ফেলে। একাত্মতা বজায় রেখে, একটি দেশ অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা কাটিয়ে উঠে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজস্ব মর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

(গ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

অভ্যন্তরীণ ঐক্য কোনো দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নতির জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একত্রিত হলে, মুসলিম দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

২. মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জসমূহ

মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে এবং তাদের একক অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলছে।

(ক) রাজনৈতিক বিভাজন

বিশ্বব্যাপী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। কিছু দেশ একে অপরের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে, যা তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে দুর্বল করে। উদাহরণস্বরূপ, সুন্নি-শিয়া বিভাজন বা আরব-অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ ঐক্যের পথে বড় বাধা।

(খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রবল। কিছু মুসলিম দেশ অত্যন্ত ধনী এবং উন্নত, যেমন সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, আর অন্যদিকে পাকিস্তান, সোমালিয়া এবং ইয়েমেনের মতো দেশগুলো অত্যন্ত দরিদ্র। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা সৃষ্টি করছে।

(গ) ধর্মীয় বিভাজন

শিয়া-সুন্নি, সালাফি, বাহাই এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে তীব্র বিভাজন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান। এই ধর্মীয় বিভাজন জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিভেদ সৃষ্টি করে এবং দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে দুর্বল করে তোলে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ

বিভিন্ন পশ্চিমা শক্তি ও বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব ফেলছে। তাদের রাজনৈতিক, সামরিক, এবং অর্থনৈতিক নীতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৩. অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপ

মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) রাজনৈতিক সংলাপ ও সহযোগিতা

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন দূর করতে একটি স্থায়ী সংলাপ এবং সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশগুলো একে অপরকে সমঝোতা এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। এই ধরনের সংলাপ তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য স্থায়ী করতে সহায়ক হতে পারে।

(খ) ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

ধর্মীয় নেতাদের এবং উলামাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক ঐক্য স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। শিয়া-সুন্নি বিভাজন সহ অন্যান্য ধর্মীয় দ্বন্দ্বগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। মুসলিম বিশ্বে ইসলামিক শিক্ষার প্রতি সম্মান এবং ঐক্যের কথা বলা উচিত।

(গ) অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

মুসলিম দেশগুলো একে অপরের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষা করতে পারে। অর্থনৈতিক সমন্বয়ের ফলে রাজনৈতিক সম্পর্কও দৃঢ় হবে এবং দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সমঝোতা সৃষ্টি হবে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় একতা

মুসলিম দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে একযোগে কাজ করতে হবে। তারা যদি সম্মিলিতভাবে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন করে, তবে তা মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ইসলামিক বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি আনতে সাহায্য করবে। এর জন্য অবশ্যই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভাজন দূর করতে হবে এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা এবং একতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং এক শক্তিশালী মুসলিম বিশ্ব গড়ে তুলতে পারবে।

## ১২.ধর্মীয় ভেদাভেদ এবং উম্মাহর ঐক্য

মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক লক্ষ্য, যা ইসলামের মূল আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ'ই প্রেরণা এবং শান্তির মূল চিত্র। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ, বিশেষত সুন্নি ও শিয়া মতাদর্শের মধ্যে বৈষম্য এবং অন্যান্য মতের মধ্যে বিভাজন উম্মাহ'র ঐক্যকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এই ধর্মীয় ভেদাভেদ শুধু মুসলিম বিশ্বে অভ্যন্তরীণ বিভাজন সৃষ্টি করছে না, বরং মুসলিম জাতির ঐক্য এবং একাত্মতার পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, এই প্রবন্ধে মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ বিষয়ক পরিস্থিতি ও এর প্রভাব আলোচনা করা হবে এবং উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হবে।

১. ধর্মীয় ভেদাভেদের মূল কারণ

মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি মূল কারণে, যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(ক) শিয়া-সুন্নি বিভাজন

বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ সুন্নি মুসলিম, কিন্তু শিয়া মুসলিমদেরও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। ইতিহাসগত কারণে সুন্নি এবং শিয়া মুসলিমদের মধ্যে মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক পার্থক্য দেখা দেয়। প্রথম ফিতনার (যুদ্ধ) পর থেকেই এই বিভাজন আরও গভীর হয়েছে। বিভিন্ন ইতিহাসিক ঘটনাবলী এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে, যার ফলস্বরূপ মুসলিম বিশ্বে একটি দীর্ঘকালীন শিয়া-সুন্নি বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) ইসলামিক ধারার বৈচিত্র্য

ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক, আইনগত এবং বিচারিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেমন হাম্বলি, মালিকি, শাফি এবং হানফি মাজহাব। এই মাজহাবগুলোর মধ্যে কিছু ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও, মুসলিম সমাজের ঐক্যকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতভেদ

মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের মাঝে একাধিক মতবিরোধ রয়েছে, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে; কিছু দেশ ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে পছন্দ করে, আবার কিছু দেশ আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। এই বৈষম্য মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় ভেদাভেদ এবং ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. ধর্মীয় ভেদাভেদের প্রভাব

ধর্মীয় ভেদাভেদ মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য ও অখণ্ডতায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে, যা বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে।

(ক) সামাজিক বিশৃঙ্খলা

শিয়া-সুন্নি বিভাজন ও অন্যান্য ধর্মীয় বৈষম্য মুসলিম সমাজে আস্থাহীনতা ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে। এর ফলে, সমাজে সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি এবং শান্তি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মর্মান্তিক সহিংসতা এবং ধর্মীয় সংঘর্ষ এ ধরনের বিভাজনেরই ফলস্বরূপ।

(খ) রাজনৈতিক অস্থিরতা

ধর্মীয় ভেদাভেদ মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্যকে দুর্বল করে দেয়। অনেক দেশে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ এবং ধর্মীয় মতাদর্শগত বিভাজনের কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এই অস্থিরতা উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা।

(গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতা

ধর্মীয় ভেদাভেদ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভাজন সৃষ্টি করে। কিছু দেশ একে অপরের প্রতি বিরোধিতা করতে থাকে, যার ফলে আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং সহযোগিতা দুর্বল হয়।

৩. উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ

ধর্মীয় ভেদাভেদ সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যদি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ আন্তরিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

(ক) ধর্মীয় সংলাপ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা

ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ। শিয়া-সুন্নি সহ বিভিন্ন ইসলামিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একে অপরকে বুঝতে এবং সমঝোতায় আসতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে উলামা, মুফতী এবং ধর্মীয় নেতাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) ইসলামিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা ইসলামের মৌলিক আকীদা ও দর্শন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে। উম্মাহ'র ঐক্য রক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম, যা ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করতে সহায়ক হতে পারে।

(গ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

মুসলিম দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক বিভাজন ও পার্থক্য সত্ত্বেও, ইসলামিক দেশগুলো একে অপরকে সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

(ঘ) ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচার

ইসলাম শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং মানবাধিকারের ধর্ম। ধর্মীয় বিভাজন এবং সহিংসতার পরিবর্তে, মুসলিম সম্প্রদায়কে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচার করতে হবে। এটি ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করতে এবং উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

ধর্মীয় ভেদাভেদ মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা হলেও, ইসলামিক মূল্যবোধ এবং উম্মাহ'র ঐক্য রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই বিভাজন দূর করা সম্ভব। উম্মাহ'র ঐক্য মুসলিমদের জন্য একটি ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক দায়িত্ব। একে প্রতিষ্ঠা করতে, মুসলিম বিশ্বকে ধর্মীয় সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা এবং একতা বজায় রাখার জন্য কঠোরভাবে কাজ করতে হবে। মুসলিমরা যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে, তবে বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী এবং একাত্ম মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

## ১৩.উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঐক্যের সংজ্ঞা

ইসলামে ঐক্য একটি মৌলিক আদর্শ। মুসলিম উম্মাহকে একটি দেহের মতো বিবেচনা করা হয়—যেখানে একটি অঙ্গ কষ্ট পেলে পুরো দেহ কষ্ট পায়। এই ঐক্য কেবল আবেগগত নয়; বরং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন সম্ভব। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং আন্তরিকতার ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রবন্ধে আমরা উম্মাহর ঐক্যের প্রকৃত সংজ্ঞা ও রূপ কী, এবং তা প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভূমিকা বিশ্লেষণ করব।

১. ঐক্যের সংজ্ঞা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামী পরিভাষায় "ঐক্য" বলতে বোঝায়—আক্বীদা, উদ্দেশ্য ও কর্মে সামঞ্জস্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

কোরআনুল কারিমে বলা হয়েছে:
"আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
— সূরা আলে ইমরান: ১০৩

এই আয়াতটি উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তিভূমি, যেখানে আল্লাহর রজ্জু মানে তাঁর কিতাব, দ্বীন ও শরিয়াহ। সেই অনুসারে ঐক্য মানে হবে—আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য একত্র থাকা, এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে একে অপরকে সহযোগিতা করা।

২. পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব

উম্মাহর ঐক্য শুধু চিন্তাগত বিষয় নয়; এটি বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য একটি নীতি। এতে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, এবং দায়িত্ববোধ অপরিহার্য।

(ক) সামাজিক সহযোগিতা

সমাজে একে অপরের প্রয়োজন বুঝে সহায়তা করাই ইসলামের শিক্ষা। ধনী দরিদ্রের পাশে থাকবে, শিক্ষিত অশিক্ষিতকে সাহায্য করবে—এভাবেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে।

(খ) রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা

মুসলিম দেশগুলো পরস্পরের উন্নয়নে সহযোগিতা করলে তাদের মাঝে বিশ্বাস ও সংহতি গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো গেলে একটি শক্তিশালী মুসলিম ব্লক তৈরি হতে পারে।

(গ) ধর্মীয় সহানুভূতি

মতভেদ থাকা স্বাভাবিক, তবে তা যেন শত্রুতা বা বিচ্ছিন্নতার রূপ না নেয়। সহানুভূতির ভিত্তিতে মতপার্থক্য মেনে নেওয়া এবং একে অপরের অবস্থানকে সম্মান করা মুসলিম ঐক্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা

উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যেসব বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা হল:

গোঁড়ামি ও দলাদলি

স্বার্থান্বেষী রাজনীতি

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ

বিদ্বেষমূলক ধর্মীয় প্রচার

অভ্যন্তরীণ দুর্বল নেতৃত্ব

এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করে কেবলমাত্র সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

৪. ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাস্তব পদক্ষেপ

উম্মাহর ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিচের কিছু কার্যকর উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে:

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গঠন

ধর্মীয় মতভেদের প্রতি সহনশীল মনোভাব গড়ে তোলা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম জাতিগুলোর সম্মিলিত কণ্ঠস্বর

তরুণদের ইসলামী নেতৃত্ব ও ঐক্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

উম্মাহর ঐক্য শুধুমাত্র কোনো কল্পনাপ্রসূত ধারণা নয়; এটি এক বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। ঐক্যের সংজ্ঞা হলো—আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করা। মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের ভেদাভেদ ভুলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা কেবল আধ্যাত্মিকভাবে নয়, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

## ১৪.আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য: চ্যালেঞ্জ ও পথ

আজকের বিশ্ব একটি আন্তঃসংযুক্ত ও বৈশ্বিক সমাজে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অন্য রাষ্ট্রগুলোর উপর প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য কেবল একটি আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় বিষয় নয়; বরং এটি একটি কৌশলগত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ভর বাস্তবতা। মুসলিম বিশ্বকে ঘিরে থাকা বৈশ্বিক

রাজনীতি, জোটনীতি ও শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তবে একইসঙ্গে এর পুনর্গঠনের বাস্তব পথও বিদ্যমান।

১. মুসলিম উম্মাহ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তবতা

মুসলিম দেশগুলোর একটি বড় অংশ ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত, এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই দুর্বলতা বৈশ্বিক শক্তিগুলোর জন্য সুযোগ তৈরি করে, যারা মুসলিম দেশগুলোকে বিভক্ত ও শোষণের নীতি গ্রহণ করে।

২. চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব-ইরান মতবিরোধ, কাতার অবরোধ, তুরস্ক-মিশর দ্বন্দ্ব ইত্যাদি তাদের পারস্পরিক আস্থা ও ঐক্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

(খ) পশ্চিমা শক্তির প্রভাব ও হস্তক্ষেপ

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এবং চীনের মত শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বে বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অস্ত্রবিক্রয়, সামরিক জোট ও অর্থনৈতিক দাননীতি মুসলিম দেশগুলোকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

(গ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে দুর্বল প্রতিনিধিত্ব

জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ, বিশ্ব ব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানে মুসলিম দেশগুলোর কণ্ঠস্বর দুর্বল, এবং তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ফলে উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক সমর্থন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. ঐক্যের পথে সম্ভাব্য উদ্যোগ

(ক) ওআইসি-এর (OIC) পুনর্গঠন

মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি-কে কাগুজে সংগঠন না রেখে একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা দরকার, যেখানে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাস্তব কাঠামো থাকবে।

(খ) কূটনৈতিক সংহতি গড়ে তোলা

যেকোনো মুসলিম দেশে বিদেশি হস্তক্ষেপ, দমন-পীড়ন বা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুর মতো বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কথা বলা, এবং একসঙ্গে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(গ) আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বাড়ালে তা বৈশ্বিক নির্ভরশীলতা কমাবে এবং ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় করবে।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্য

ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমা মুসলিমদের মধ্যে একটি আদর্শিক বন্ধন তৈরি করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈশ্বিক রাজনীতির চাপে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আজ হুমকির মুখে। কিন্তু একইসঙ্গে এই বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক। পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মিলিত কূটনীতি, ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্য গঠন করলে মুসলিম উম্মাহ একটি সম্মানজনক ও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

## ১৫. বিজ্ঞান ও ইসলামের ঐক্যঃ এক আদর্শের অনুসন্ধান

বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রায়শই পরস্পরবিরোধী হিসেবে চিত্রিত হলেও, ইসলাম এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই বিজ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চা ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে, এবং এই ঐক্য উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য সাধনে কী ভূমিকা রাখতে পারে।

**ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব**

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। কুরআনের প্রথম নির্দেশই ছিল “ইকরা” — পড়ো (সূরা আল-আলাক: ১-৫)[^1]। আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য আয়াতে চিন্তা, গবেষণা ও সৃষ্টির উপরে মনোযোগ দিতে বলেছেন (সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)[^2]। রাসূল (সা.) বলেন: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ফরজ"[^3]। এইসব নির্দেশনা প্রমাণ করে যে ইসলাম কেবল ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় থেমে নেই, বরং এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যও দ্বার খুলে দিয়েছে।

ইতিহাসে ইসলাম ও বিজ্ঞানের সোনালি যুগ

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় বাগদাদে "বায়তুল হিকমা" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা গ্রিক, ভারতীয় ও ফারসি জ্ঞান অনুবাদ ও উন্নয়ন করেন। উদাহরণস্বরূপ, আল-খাওয়ারিজমি অ্যালজেব্রার ভিত্তি স্থাপন করেন[^4], ইবনে সিনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার Canon of Medicine গ্রন্থের মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেন[^5]। ইবনে হাইথাম আলোক বিজ্ঞানে আধুনিক পদ্ধতির সূচনা করেন, যাকে আজকের বিজ্ঞানে "scientific method"-এর পূর্বসূরি বলা হয়[^6]।

আধুনিক যুগে বিভক্তির সূচনা

উপনিবেশবাদের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ঢুকে পড়ে এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চা হ্রাস পায়। এর ফলে বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে পৃথক ও কখনো কখনো বিরোধী হিসেবে দেখা হয়। ফলে এক শ্রেণির মুসলিম বিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে, যা উম্মাহর মেধাগত দুর্বলতার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়[^7]।

বিজ্ঞান-ইসলাম ঐক্য: আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান সময়ে কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। যেমন, কুরআনে ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে সূরা আল-মু’মিনুন (২৩:১২-১৪) এ বর্ণিত হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা হয়[^8]। এই চিন্তাধারাকে "Islamic scientific exegesis" বলা হয়ে থাকে, যদিও একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দার্শনিক বিতর্কও রয়েছে।

উম্মাহর ঐক্যে বিজ্ঞান-ইসলাম ঐক্যের ভূমিকা

বিজ্ঞান ও ইসলামের ঐক্য মুসলিম সমাজে জ্ঞানের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। মুসলিম দেশসমূহ যদি যৌথভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিনিয়োগ করে এবং

ইসলামী মূল্যবোধ ও প্রযুক্তিকে একত্র করে, তবে তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান একটি সাধারণ ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে যেখানে মতাদর্শগত বিভাজন সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে[^9]।

বিজ্ঞান ও ইসলামের ঐক্য শুধুমাত্র ধর্ম ও প্রযুক্তির সমন্বয় নয়, বরং এটি একটি আদর্শিক ভিত্তি, যা মুসলিম উম্মাহকে চিন্তা, গবেষণা এবং উন্নয়নের পথ দেখাতে পারে। অতীত আমাদের প্রমাণ দিয়েছে, আর ভবিষ্যত আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে—এই ঐক্যকে কেন্দ্র করে একটি জ্ঞাননির্ভর, নৈতিকতাভিত্তিক ও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গড়ে তোলার।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের ঐক্য কেবল অতীত গৌরবের স্মারক নয়, বরং তা ভবিষ্যতের পথনির্দেশক। যখন মুসলিম উম্মাহ বিজ্ঞানকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে গ্রহণ করবে, তখন তারা একটি জ্ঞাননির্ভর, ঐক্যবদ্ধ এবং নৈতিকতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। এই ঐক্য উম্মাহর মধ্যে বিভাজনের বিপরীতে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম গঠনে সাহায্য করতে পারে, যা শুধু ধর্মীয় নয় বরং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

উদ্ধৃতিযোগ্য Thesis Statement:

"ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক; এই ঐক্য মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান, নৈতিকতা এবং উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে একটি আদর্শিক ও বাস্তবসম্মত ঐক্যের পথ উন্মুক্ত করে।"

## ১৬. উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী মূল্যবোধের ভূমিকা-

১. তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্য

ইসলামী ঐক্যের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ—এক আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্য। এই তাওহীদের ধারণা মুসলিমদের অন্তরে এমন এক অভিন্ন আত্মপরিচয় সৃষ্টি করে, যা জাতীয়তা, গোত্র বা ভাষাগত ভিন্নতাকে ছাড়িয়ে যায়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমাদের এই উম্মাহ একটাই উম্মাহ, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো” (সূরা আল-মুমিনূন: ৫২)। তাওহীদ একটি সামষ্টিক আত্মচেতনা জাগ্রত করে যা মুসলিমদের মধ্যে আত্মিক ঐক্য গড়ে তোলে।

২. উখুয়াহ বা ভ্রাতৃত্ববোধের গভীরতা

উখুয়াহ ইসলামী সমাজের এমন এক নৈতিক স্তম্ভ, যা ঈমানী সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্ক থেকেও বেশি দৃঢ় করে তোলে। সাহাবিগণের মধ্যে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতির উদাহরণ ঐক্যের বাস্তব নমুনা। এটি এমন একটি মূল্যবোধ, যা মুসলিমদের মতপার্থক্যের মাঝেও আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলে।

৩. ইনসাফ ও আদল (ন্যায় ও ভারসাম্য)

ইসলামে ইনসাফ শুধু বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আচরণের মাপকাঠি। কুরআনে আছে, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য ইনসাফের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো" (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)। কোনো গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা ন্যায়ের ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না—এমন শিক্ষা উম্মাহকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

৪. আমানতদারি ও বিশ্বাসযোগ্যতা

উম্মাহর মধ্যে আস্থাহীনতা আজ বড় একটি চ্যালেঞ্জ। ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী আমানত রক্ষা এবং সত্যবাদিতা সমাজের ভিত্তি। রাসূল (সা.) বলেন: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই, যার কাছ থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে তার মুখ ও হাত থেকে" (সহীহ বুখারী)। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আমানতদার নেতৃত্বই উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

৫. তাকওয়া: একতা ও ঈমানের ভিত

তাকওয়া মানে হলো আল্লাহভীতি এবং তাঁর বিধান মেনে চলা। এটি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও বিনয় সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান" (সূরা হুজরাত: ১৩)। এই মাপকাঠি সব ধরনের গোষ্ঠীগত বৈষম্যকে অগ্রাহ্য করে এবং একটি ন্যায়সংগত ঐক্যের কাঠামো গড়ে তোলে।

৬. ইখলাস (নির্ভেজাল নিয়ত) ও আত্মশুদ্ধি

ঐক্যের জন্য ইখলাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তখন স্বার্থপরতা, হিংসা বা প্রতিযোগিতা কমে যায়। ঐক্য তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তাদের নিয়ত বিশুদ্ধ রাখে এবং নিজেদের রাগ-ক্ষোভ দমন করে।

৭. তাওয়াজ্জুহ ইলাল কাওম বা সমাজমুখীনতা

ইসলামী মূল্যবোধ ব্যক্তি নয়, সমাজকেন্দ্রিক। মুসলিমদের দায়িত্ব কেবল নিজের উন্নতি নয়, বরং সমাজকে আলোর পথে এগিয়ে নেওয়া। রাসূল (সা.) বলেন: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই, যে মানুষের উপকারে আসে" (আল-মুজাম)। এই নীতি মুসলিমদের সামষ্টিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহায়তায় অনুপ্রাণিত করে, যা ঐক্যের পথ প্রশস্ত করে।

৮. তানাসুহ বা পরস্পরের উপদেশ দেওয়া

উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ তখনই বিভাজনে রূপ নেয় যখন উপদেশ ও সমালোচনা সদাচরণ ও সৌজন্যের মাধ্যমে হয় না। রাসূল (সা.) বলেন: "দীন হচ্ছে উপদেশ"। উপদেশ গ্রহণ ও প্রদানের এই মানসিকতা ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করে এবং মতপার্থক্যকে বিরোধে পরিণত হতে দেয় না।

৯. সবর ও সহনশীলতা: মতভেদের ব্যবস্থাপনা

ঐক্য রক্ষায় সবসময় মতভেদ মেনে নেওয়া এবং সহনশীলতা প্রদর্শন অপরিহার্য। ইসলামে বলা হয়েছে, "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন" (সূরা বাকারা: ১৫৩)। ইতিহাসে দেখা যায়, সাহাবিগণ বহু বিষয়ের মধ্যে ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও সম্মান বজায় রেখে ঐক্য রক্ষা করেছেন।

১০. সামষ্টিক কল্যাণের চিন্তা (মাসলাহা উম্মাহ)

ইসলামে ব্যক্তিক স্বার্থের চেয়ে উম্মাহর সামষ্টিক কল্যাণ বড়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে পরস্পরের সহানুভূতি, আত্মত্যাগ এবং দায়বদ্ধতা গড়ে তোলে, যা শক্তিশালী ঐক্যের ভিত্তি।

ইসলামী মূল্যবোধ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সেই আত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি, যা বাহ্যিক চুক্তি ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার চেয়ে গভীর ও টেকসই। যখন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকল

স্তরে এই মূল্যবোধ চর্চা করা হবে, তখন উম্মাহর বিভেদ পরাস্ত হবে, এবং একটি পরিশীলিত, ন্যায়নিষ্ঠ ও ঈমানদার জাতি হিসেবে মুসলিম উম্মাহ বিশ্বে নেতৃত্বে আসবে।

বিরোধ ও বিভেদের এই উপাখ্যান পীড়াদায়ক সত্যি, কিন্তু ভীতিকর নয়। মুসলিম উম্মাহ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন জাতি নয়। কেননা জাতি গড়ে উঠে একটি জনগোষ্ঠীর সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে উম্মাহ গড়ে উঠে একটি আদর্শের ভিত্তিতে। একটি আদর্শবাদী দল বা গোষ্ঠীর আপোষহীন সংগ্রামের পরিণতিতে উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসুলগণ ও আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারাই একাকীভাবে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে তুলেননি, বরং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এক লোক গড়ে তুলেন এবং তাদের সাহায্যে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। সংঘবদ্ধ জীবনের জন্যে অপরিহার্য উপাদানগুলোর অবিকৃত উপস্থিতি উম্মাহর স্থায়ীত্ব সুনিশ্চিত করে। অকৃত্রিম ঐসব উপাদানগুলোর বিকৃতি উম্মাহকে রোগাক্রান্ত করে দেয়। উম্মাহর জীবনে সৃষ্ট রোগ বা দূর্বলতা দূর করার সঠিক প্রচেষ্টার বা প্রয়াসের মাধ্যমেই এর যাত্রা পথ সুগম হয়। আদর্শিক বিরোধ বা বিভেদ আমাদের উম্মতকে রোগাগ্রস্থ বা দূর্বল করে ফেলেছে। ইসলামী আদর্শের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ ইসলামী উম্মাহর জীবনে এই আর্দশের বহিপ্রকাশ ঘটে। আদর্শের আংশিক আমল ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা যায় সত্যি, কিন্তু তারও কাংখিত প্রতিফলন ঘটে সংঘবদ্ধ সমাজে। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমলের ভিত্তিতে ইসলামী উম্মাহর চরিত্র বজায় রাখা সম্ভব নয়। দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে তেমনি একটি ইসলামী উম্মাহর মডেল সৃষ্টি করে রাসুলে আযম তিরোধান করেন। রাসুলে আযমের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ পঠিত অহীর মাধ্যমে কোরআনে ঘোষিত হলো;

لكم دينكم و اتممت عليكم نعمق ورضيت لكم الاسلام دينا -اليوم اكملت

(আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপরই আমি সন্তুষ্টি হয়েছি।) অর্থাৎ ২৩ বছরের নবীয়তী জীবনে রাসুলে পাক যে আকিদা বিশ্বাস তুলে ধরেছেন, তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের যে জ্ঞান দিয়েছেন, ইবাদাত বন্দেগীর যে সব নিয়ম-নীতি নিজের আমলের আদর্শে প্রমাণ করেছেন। মুসলমানদের সামাজিক জীবনের জন্য যে সব মূলনীতি প্রনয়ন করেছেন ও কার্যকরী করেছেন। জিহাদ পরিচালনা করেছেন, সম্পদের ব্যবহার বণ্টন, লেনদেন-ব্যবসা বানিজ্যের বিধি বিধান সমূহ, হালাল হারামের শ্রেনী বিন্যাস করেছেন, প্রসাশনিক ব্যবস্থা চালু করেছেন, ফৌজদারী ও নাগরিক অধিকারের আইন দিয়েছেন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করেছেন, এক কথায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অমুসলিম জনগনের সাথে সম্পর্ক নির্ধারন করেছেন, আন্তর্জাতিক ভাবে বিশ্ব সমাজের সাথে সম্পর্কের স্বরূপ শিখেয়েছেন, সব কিছুকেই কোরআনের ভাষায় 'দ্বীন' বলা হয়েছে। এই দ্বীনের সার্বিক

প্রতিষ্ঠাই হলো তার নিয়ামতের পূর্ণতা। রাসুলের জীবনেই ইকামতে দ্বীনের সাফল্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এই আয়াত। রাসূলে পাক ইকামতে দ্বীনের মাধ্যামে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে কোরান ও হাদিসের ভাষায় উম্মাহ বা মিল্লাত বলা হয়েছে এবং সংঘবদ্ধ মুসলমানদের অভিহিত করা হয়েছে 'আল জামায়াত' বলে। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় জাতির চাইতে এর পরিধি অনেক ব্যাপক, ঐক্যের ধারনা এখানে অনেক গভীরতর ও ফলাফল ব্যাপকতর অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ।

রাসুলেপাকের শিক্ষা ও তরবীয়তের ফলে সাহাবায়ে কেরামদের মনে ইকামতে দ্বীনের উপাদান সমূহের রূপ রেখা ও তাৎপর্য সম্পর্কে কোন রূপ সংশয় বা ভ্রান্তি ছিলোনা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অপরিহার্যতা, আল-জামায়াতের ঐক্য ও সংহতির অগ্রাধিকার, আদর্শের অগ্রাধিকার ও অবিকৃত প্রয়োগ সম্পর্কে তারা সজাগ প্রহরী ছিলেন। তাই আল জামায়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থেই সাহাবায়ে কেরামগন রাসুলে পাকের ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহাবায়ে কেরামগন রাসুল পাককে তাদের সন্তান সন্ততি তথা আপন জীবনের চাইতে ও ভাল ভাসতেন, তার এতটুকু ইঙ্গিতে হাসী মুখে জীবন উৎসর্গ করতেন। সেই সাহাবাগন তাদের প্রাণ প্রিয় রাসুলে আযমের দাফন-কাফনের চাইতে উম্মাহর নেতৃত্ব বা খিলাফত নির্বাচনকে প্রাধান্য দেন। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অস্তিত্ব ইকামতে দ্বীনের জন্য অপরিহার্য শর্ত, একথাটি সাহাবায়ে কেরামগণ কতো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতেন তা প্রমাণিত হয়না কি?

দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য বা আল জামাতের উপস্থিতি অপরিহার্য মৌলিক শর্ত। এমনকি আল জামায়াতের অনুগত্য ছাড়া কোন ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য ও থাকতে পারেনা।

**ইকামতে দ্বীন ও ইসলামী রাষ্ট ব্যবস্থা–**

আরবী শব্দ ইকামতের অর্থ হলো 'প্রতিষ্ঠা করা' ও 'প্রতিষ্ঠা রাখা'। আল্লাহর দ্বীনের সাথে যখন ইকামত শব্দটিকে মিলানো হয়। তার অর্থ দাড়ায় 'আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা' ও 'আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা'

আবার 'ইকামাহ' শব্দটি যখন কোন বস্তুর জন্যে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় খাড়া করা, যেমন সূরা তাহাতে খেজেরের কিসসায় বলা হয়েছে, ))يريد ان ينقض فاقامه كهف((
(দেয়ালটি) পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো (তখন হযরত খেজের) তাকে খাড়া করে দিলেন।) কিন্তু যখন ইকামাহ শব্দটি কোন কাজ বা আমলের জন্যে ব্যবহত হয়, তার অর্থ হয় কাজটি তার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যেনো প্রতিষ্ঠিত রূপটি দেখে কাজটির পূর্ণ চিত্র ফুঠে উঠে।

তাই কোরআনে যখন বলা হয়েছে )اقيموا الصلوة( )নামাজ কায়েম করো) তার অর্থ দাড়ায় নামাজকে তার সমস্ত নিয়ম নীতি সহ বাস্তবায়িত করা, গোসল, অজু সহ পবিত্রতা লাভ, স্থানের পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা, কিরাতের পরিশুদ্ধতা, সঠিক ভাবে উঠা, বসা, রুকু সিজদা, ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি নিয়মাদীর পরিপুরন করে নামাজ আদায় করা, তথা মসজিদের প্রতিষ্ঠা, জামায়াতের ব্যবস্থা, জামাতের নিয়ম শিংখলা, ইমামের উপস্থিতি, নির্ধারিত সময় সীমার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহ সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন নিয়ম কানুন ও শৃংখলাকে মেনে নামাজ আদায় করাকে নামাজ কায়েম করা বলা হয়। এভাবে ইকামতে দ্বীনের অর্থ হলো দ্বীনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল শর্তাবলী, নিয়ম কানুন, শৃংখলা তথা দ্বীনের সকল শাখা প্রশাখা সহ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা যেন তার প্রতিষ্ঠিত রূপকে দেখলে দ্বীনের পরিপূর্ণ চিত্র অবলোকন করা যায়।

ইসলামী প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইনের প্রয়োগ পদ্বতি প্রনয়নের নিমিত্তে গঠিত আইন বিভাগের বিন্যাস, মানুষের ব্যক্তি অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আইনের শাসন কায়েম, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধীর ব্যবস্থাপনা,আদর্শ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানুষের নৈতিক ধর্মীয়, আর্থিক ও শিক্ষার উন্নয়ন তথা নামাজ কায়েম করা, যাকাত ব্যবস্থা চালু করা, অপরাপর ইবাদাত বন্দেগীর কাজ মিলে সবই ইকামতে দ্বীনের অংশ। তেমনি নেক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা ও উৎসাহ প্রদান, অন্যায়, অশ্লিল ও চরিত্রহীনতার উচ্ছেদ করাও ইকামতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো ইকামতে দ্বীনেরই কাজ। কেননা দ্বীনের মধ্যে সকল আনুগত্য ও আনুগত্যের বিধান সমুহ শামিল রয়েছে। কোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে,

ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم - )يوسف (

(আল্লাহ ছাড়া কারো শাসন করার ক্ষমতা নেই, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে তাকে ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবেনা, এটাই আনুগত্যের সরল পথ।)

و لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدا الله واجتنبوا الطاغوت - )النحل ٣٦ (

(আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি যেনো তোমরা আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং তাগুতের অনুসরণ থেকে দূরে থাকো।)

এমন কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শক্তি যা খোদাদ্রোহিতার পথে চলে এবং আল্লাহর বন্দেগীর পরিবর্তে অন্য কারো বন্দেগীর আহবান জানায়, তাদেরকেই কোরআনের পরিভাষায় 'তাগুত' বলা হয়েছে। ইসলামী সরকার বা আল জামাতের অনুসরণ ছাড়া তাগুত থেকে দূরে থাকার কোন উপায় নেই।

الفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون - )المائدة )٥٠(

(তারা কি জাহিলী ফয়সালা চায়? কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যয়শীল জাতির জন্যে আল্লাহর চাইতে ভালো ফয়সালা কারী আর কে হতে পারে?)

و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل - )النساء )٥٨(

(যখন জনগণের মধ্যে ফয়সালা করো তবে ইনসাফের সাথে করবে।)

এই ইনসাফ কি সরকার ছাড়া সম্ভব?

يا داؤد انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل - الله

ص )٢٦()

(হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, তাই তুমি হকের সাথে জনগণের মধ্যে ফয়সালা করো এবং মনোবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।)

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس - )الحديد )٢٥(

(আমি আমার রাসুলদেরকে প্রকাশ্য হিদায়াত সহ পাঠিয়েছি, তাদের সাথে আমি ইনসাফের মানদন্ড ও কিতাব নাযিল করেছি যেনো জনগন ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে পচন্ড শক্তি এবং মানুষের কল্যান নিহিত রয়েছে।)

এই আয়াতে 'মিযান' বলতে ইনসাফের মানদন্ড বলা হয়েছে, যার দ্বারা সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায়। আবার লোহার কথা বলা হয়েছে, বিশিষ্ঠ মোফাসসিরদের মতে এর দ্বারা রাষ্ট্রীয়

প্রচন্ড শক্তির কথা বলা হয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্র শক্তির ব্যবহার রাষ্ট্রীয় শক্তিরই বাহন। লোহা হলো সমস্ত অস্ত্রের মূল উপাদান, যার মধ্যে মানুষের সার্বিক কল্যান নিহিত রয়েছে। আয়াতে হাদীদ বা লোহা নাযিল করার কথা বলা হয়েছে, যদি এর অর্থ পর্দাথ হিসাবে লোহা হতো, তবে তার জন্যে সৃষ্ঠির কথা বলা হতো। পদার্থ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইনসাফের মানদন্ডের সাথে হাদীদ নাযিল করার মাধ্যে রাষ্ট্রিয় শক্তির অর্থই বহন করে। ইনসাফের লক্ষ্যে এই লোহার মধ্যে মানুষের জন্যে কল্যাণ রগে, এর মধ্যেও এই তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

## ২.ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন ও উম্মাহর ইতিহাস।

খেলাফতে রাশেদার যুগে আল্লাহর দ্বীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। খেলাফতে রাশেদার পতনের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পরিবর্তে রাজতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। শাসন ক্ষমতা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার নিমিত্তে ইসলামী মূলনীতি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। বাইতুল মালকে ক্ষমতার মসনদকে ঢিকে রাখার জন্যে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হতে থাকে। জনগণের সম্পদ ব্যক্তি ও পারিবারিক সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যক সাহাবাদের উপস্থিতি ও সত্যিকার ঈমানদার মুসলমানদের বিশালত্ব ও শক্তিহীন হয়ে যায়। তারা অসহায়ের জীবন যাপন করতে থাকেন। রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের মতো মুসলিম উম্মাহর বুকে চেপে বসে। ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শতকে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যে বার বার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং রাজতন্ত্রী শক্তি প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই কঠোরভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন সাধনের কোন পথ খোলা না থাকায় স্বশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিলো না। হযরত হোসাইন (রাঃ) সর্বপ্রথম এ পথে এগিয়ে আসেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবা, তাবেয়ী উলামা ও ঈমামদের মধ্যে কেউ এর বিরূদ্ধে মতামত দেননি। যারাই এ স্বশস্ত্র বিপ্লবের বিরূদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং এই বলে বারণ করেছিলেন যে ইরাকবাসীগণ তাদের দাওয়াতে বিশ্বস্ত নয়। তাদের সম্ভাব্য বিশ্বাস ঘাতকতায় মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে

কেউ এর বিরোধিতা করেন নি, তারা মনে করতেন হযরত হোসাইনের পূর্বে তারা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই তাদের কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। এর পর যা ঘটেছে তা আমরা সবাই জানি। খেলাফতে রাশেদার পর ইকামতে দ্বীনের এই প্রথম প্রয়াশ ব্যর্থ হয়ে যায়, শুধু ব্যর্থ হয়ে যায় বললে ভুল হবে বরং এই মর্মান্তদ ঘটনা ইকামতে দ্বীনের সম্ভাবনা দীর্ঘদিনের জন্যে নাকস করে দেয়। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে এই প্রচেষ্টার আরো কয়েক বার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

হযরত হোসাইনের পৌত্র হযরত যায়িদ বিল আলী, যিনি সেই যুগের বিশিষ্ট আলেম ও ইমাম ছিলেন, এই পথে এগিয়ে আসেন। কুফাবাসীগণ তার হাতে বায়াত করে বিপ্লব সফল করার শপথ নেয়। এইভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন চলছিলো, উমাইয়া শাসকগণ খবর পেয়ে যান, এমতাবস্থায় চূড়ান্ত প্রস্তুতির পূর্বেই হযরত যায়িদ বিন আলী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। কুফাবাসীরা আবারো বিশ্বাস ঘাতকতা করলো। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে এই সংঘর্ষে যায়িদ বিন আলীর সাথে মাত্র দুই শত আঠারো জন সঙ্গী ছিলেন। অতঃপর তার বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ঘটনা সংগঠিত হয় হিজরী ১২২ সালে।

অতঃপর হিজরী ১৪৫ সালে হযরত মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, যাকে নফসে যাকিকষা বলে অভিহিত করা হয়, এবং তার ভাই ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ, যারা হযরত হাসানের (রাঃ) বংশদ্ভুত ছিলেন। আব্বাসী খলিফা মনসুর ও উমাইয়া শাসনের উৎখাতের জন্যে এই ভাইয়ের হাতে বায়াত করে ছিলেন। পরে আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার প দ্বীনের এই আন্দোলন গোপনীয়তার সাথে সংগঠিত হতে থাকে। ইমাম নফ হিযাযে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, পক্ষান্তরে তার ভাই ইব্রাহিম কুফায় তার দে করেন। আব্বাসী খেলাফতের পক্ষে যে গোপন আন্দোলন চলছিলো, ইকামতে দ্বীনের এই আন্দোলন তার চেয়ে কম ছিলো না।মনসুর এই আন্দোলন কে নস্যাৎ করার জন্যে সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। কিন্তু সারা দেশেই দুই ভাইয়ের আন্দোলন দানা বেধে উঠে। একের পর এক সাফল্যের খবরে মনসুর খুবই পেরেশান ছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী সাম্রাজ্য মুমুর্ষ অবস্থায় যে কোন সময়ে পতনের অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু ইমাম নফসে যাকিয়া ও ইব্রাহিমের পরিচালিত আন্দোলনের ভাগ্য পূর্বতন আন্দোলন থেকে ভিন্ন ছিলো না। ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ) এই দুইটি আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন। তার মতে অনৈসলামী সরকারের বিরূদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের পথ খোলা না থাকলে বিপ্লবের মাধ্যমেও সরকার পরিবর্তন করা বৈধ। তিনি মুসলিম সমাজে অনৈসলামী সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে চিত্রিত করেন। তবে বিপ্লব তখনই বৈধ যখন বিপ্লবের সাফল্যে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ব্যর্থ অভ্যুত্থান দ্বারা জীবন ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। বরং সার্বিক প্রস্তুতি ছাড়া যে বিপ্লব করা হয় তার দ্বারা আত্মঘাতী কার্যক্রমে সাহায্য করার নামান্তর হবে, এবং তেমনি ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আপামর জনসাধারনের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়, যা ভবিষ্যতে সফল আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর। মৌখিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনের জন্যে সমর্থন দেন। হযরত যায়েদের আন্দোলনকে তিনি রাসুলে পাকের বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন। অর্থাৎ তার কাছে যায়েদের বিপ্লবী আন্দোলন সন্দেহাতীতভাবে হকপন্থী ছিলো। নফসে যাকিকয়ার আন্দোলনের পক্ষে তিনি প্রকাশ্যে জনমত গঠন করতেন। তিনি এই আন্দোলনের কাজকে নফল উমরা বা হজ্বের চাইতে ৫০ গুণ সোয়াবের কাজ বলে ফতোয়া দিতেন। তিনি ঘরোয়াভাবে এমনও বলতেন যে কাফেরদের সাথে জিহাদের চাইতেও এই বিপ্লবে অংশ নেয়া বেশী নেকীর

কাজ। অনৈসলামী সরকারের বিরূদ্ধে বিপ্লব সংঘটের প্রশ্নে ইমাম আজম শুধু একা সমর্থন করেন নি, বরং তৎকালীন ফকীহদের মধ্যে ইমাম মালেক (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও বিপ্লবের স্বপক্ষে মত দেন।

(এইসব বিপ্লবের বা ইকামতে দ্বীনের লক্ষে পরিচালিত বিদ্রোহের পক্ষে মতামত দেবার পথে তারা শর্ত আরোপ করেন। ইমাম আবু হানিফার এবং অপরাপর সমকালীন ইমামদের দৃষ্টিতে যখন বিপ্লবের সাফল্যে কোন রূপ সন্দেহ না থাকে বা বিপ্লবের পরিণতিতে যদি ইসলামী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় তবেই তা সমীচিন, অন্যথায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইসলামী জ্ঞানের লালন ও চর্চা নিদারুন ভাবে সংকোচিত হয়ে পড়েছে। উলেমা সমাজের অপরিহার্য ঐক্যের অভাবে তাদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। ইকামতে দ্বীনের মূল ভিত্তির উপরই এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যারা ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন করা ফরজ মনে করেন না তারা ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রতিষ্ঠিত উলেমাদের ঐ মতামতকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেন। যাকে আহলুল সুন্নতে আল জামাতের সংখ্যা গরিষ্ঠ রায় বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু উলেমাদের ঐ মতামত ছিলো মুসলিম সমাজে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, তাও এমনি এক দূর্বিসহ, অসহায় অবস্থায় যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের কোন উপায় ছিলো না, একের পর এক অভ্যুত্থান প্রয়াসের ঘটনায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির প্রমাণ তাদের সম্মুখে ছিলো, তাই বাতিল ব্যবস্থার সাথে সহ অবস্থানের জন্যে সেটি ছিলো অস্থায়ী একটি কৌশল মাত্র। সেই মতামত কোন স্থায়ী আত্ম-সমর্পন ছিলোনা। সেই
মতামত ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলোনা। তদুপরি)

গনতান্ত্রিক উপায়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে তার কোন সম্পকই ছিলো না। আজকের পরিবেশে সেই মতামতের আশ্রয় নেয়া সত্যের বিকৃতি বই কিছু নয়, বরং দ্বীনের এই চরম ও পরম দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটি খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

আর যারা ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের অপরিহার্য্যতাকে আদৌ স্বীকার করেন না, তাদের মতে কোরআনে বা হাদীসে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই সমস্ত উলেমাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই, যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন নির্দেশ না থেকে থাকে, তবে ইসলামের ইনসাফ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কি ভাবে হবে? ইসলামের দন্ডবিধি বা হোদুদ কে প্রতিষ্ঠা করবে? যে সমস্ত আয়াতে এ সব নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে সব আয়াত কি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে? বা সেগুলো কি শুধু রাসুলের যামানার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো বলে মেনে নিতে হবে।

খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সেগুলো প্রতিষ্ঠা করে কি ভুল করেছিলেন? কে বা কারা যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে? সরকারীভাবে যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন বিধান না থাকলে কি যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও সাহাবায়ে কেরামগণ ভুল করেছিলেন? যাকাত যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আদায় যোগ্য ফরজ হয় এবং তা দিতে অস্বীকার করলে যদি তাদের বিরূদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা ফরজ হয়ে থাকে, তবে নামাজ রোজা সহ অপরাপর ফরজকে অস্বীকার করলেও তাদের বিরূদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায় কি? সেক্ষেত্রে এসব জিহাদ কে পরিচালনা করবেন? এসব প্রশ্নের জবাব কি তারা দিতে পারবেন?
আসলে আত্ম-সমর্পনের এ এক জঘন্য পর্যায়। বাতিলের ভয় ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংরক্ষণই এই মানসিকতার মূল কারণ।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি ফরজ কাজ, বরং এটি হলো ইসলামের বিশিষ্ট স্তম্ভগুলোর একটি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলনীতিগুলো কোরআন মজিদে উল্লেখিত হয়েছে আর রাসুলেপাকের আমলের মাধ্যমে এর বিস্তারিত রূপরেখা উৎসারিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের দ্বারা এটা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে কোরআন আল্লাহর কালাম, মানুষের হিদায়াতের জন্য নাজিল হয়েছে। মানুষের হিদায়াতই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হুকুমতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা এর মূল লক্ষ্য নয় বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপস্থাপনাই এর উদ্দেশ্য নয়। যারা হুকুমতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠাই কোরআনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে দাবী করে কোরআন থেকে যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করেন এবং
মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে দাবী করে কোরআন থেকে যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করেন এবং রাসুলের নবুয়তী মিশনের ও মূল লক্ষ্য হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করতে চান তারা কোরআন ও রাসুলের মর্যাদাকে খাটো করে দেখেন। কোরআনী হিদায়াতের পরিধি অনেক ব্যাপকতর। কোরআনে উপস্থাপিত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সার্বভৌমত্বের সামর্থক নয়। আল্লাহর যাত ও সিফাতের প্রতি আকিদা বিশ্বাস ও আত্মসমর্পন, রাষ্ট্র ব্যবস্থার আনুগত্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণে সর্বগ্রাসী। আল্লাহর প্রতিপালন ক্ষমতার স্বরূপ, আল্লাহর ইলাহীয়াতের মহিমা, আল্লাহর হাকেমীয়াতের তাৎপর্য, পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবহৃত অনুরূপ ক্ষমতা সমূহ হতে সার্বিকভাবে মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ। এমনিভাবে নবীপাকের নবুয়তী মর্যাদাকে বাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদার সাথে তুলনা করা সমিচীন।

**ইকামতে দ্বীন তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্ম পদ্ধতি–**

ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে মিল্লাতের সবাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত আল জামায়াতের সদস্য থাকেন। কেউ রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে যেতে পারেন না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তোলা ইমানের দাবী। এ লক্ষ্যে কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচীর বিভিন্নতায় একাধিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাংগঠনিক ঐক্য ছাড়া এ পথে এতটুকু ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কোরআন মজিদে এই সাংগঠনিক ঐক্যের ডাক দেয়া হয়েছে বারে বারে। এরসাদ হয়েছে;

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا )البقرة )١٠١(

(তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুত করে ধরো এবং বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।)

অর্থাৎ তোমরা সুশৃংখলও মজবুত সংগঠন গড়ে তোল। সাংগঠনিক ঐক্য ছাড়া পৃথিবীর কোন সামষ্ঠিক কাজই আঞ্জাম দেয়া যায় না। লক্ষ্যের বিভিন্নতায় সংগঠনের ধরণ ও নিয়মনীতি ভিন্নতর হয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তথা ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের স্বরূপ অপরাপর সংগঠন থেকে ভিন্নরূপ হবে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, বৈষয়িক অপরাপর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন সমূহ থেকে এই সংগঠনের ধরণ ভিন্নতর। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা আল্লাহর হুকুমেরই বাস্তবায়ন, এখানে নেতৃত্বের লিপ্সা নেই, নেতৃত্ব কোন মর্যাদা নয়, বরং এটি হলো বিরাট দায়িত্ব। দ্বীনি দায়ীত্বের অনুভূতি নেতা ও কর্মীকে এক অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। নেতৃত্বের সমালোচনা এখানে শুধু বৈধই নয়, নিতান্ত কাম্য। পারস্পরিক পরামর্শ এখানের প্রাণ, এমনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হলো ঈমানের দাবী। হাদীসে এরসাদ হয়েছে,

اذا كان ثلاثة في سفر فيومروا احدهم )اخرجه ابو داود (

(যদি তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয় তবে তারা যেনো তাদের একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়।)

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে;

لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة في الأرض الا امرو عليهم احدهم

(তিন ব্যক্তি যারা জংগলে থাকে, তাদের জন্যেও তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতা না বানিয়ে বসবাস করা বৈধ নয়।)

যদি কোন ব্যক্তি ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে চায় তবে তাকে সাংগঠনিক জীবন যাপন করতে হবে। এ কাজের জন্যে তাকে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন এক সংগঠনে যোগ দিতে হবে, কোন এক সংগঠনকে বেছে নিতে হবে, কিংবা তাকে নতুন কোন দল গড়ে তুলতে হবে।

এর একমাত্র লক্ষ্য হবে ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, অন্য কথায় 'আল জামাত' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা অপরিহার্য। এই পর্যায়ে একাধিক ইসলামী সংগঠনের অস্তিত্ব ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণকর, আজকের ধর্ম নিরপেক্ষ পরিবেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কোন সহজ আন্দোলন নয়। সংগঠনের বা আন্দোলনের মূলনীতি ও মূল লক্ষ্যে কোন মতপার্থক্য নেই, বা এর অবকাশও নেই, কিন্তু এই আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচীতে মত পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। সমস্ত ইসলাম প্রিয় জনতাকে একই ফ্লাট ফরমে একই কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই একাধিক দল গড়ে তোলা বা বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্লাট ফরমের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করা কোন ক্ষতিকর বিষয় নয়। কর্মসূচীর পার্থক্য থাকলে ও মূল লক্ষ্য অভিন্ন। এই সব সংগঠনগুলো যদি সত্যিকার ইসলামী সংগঠন হয় তবে হিংসা-বিদ্বেষ বা দলাদলী বা রেষারেষির কোন ভয় থাকে না। মূল লক্ষ্যের ঐক্য তাদেরকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। কোন একটি দলের অবনতি বা বিপর্যয় ইসলামী আন্দোলনের যাত্রা ব্যাহত করে না। ঐ বিপর্যস্ত বা বিলুপ্ত দলটির কর্মীগণ সহজেই অন্য একটি দলে স্থান করে নিতে পারে। কোন এক দলের বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও কর্মসূচীতে অতৃপ্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন দলে তার ভূমিকা রাখতে পারে। মূল লক্ষ্যে এক মত হওয়া সত্বেও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিষ্ক্রিয়তার সাম্ভাব্য গোনাহ থেকে সে বা তারা রক্ষা পেতে পারে। আল জামায়াতের উপস্থিতি ও আল জামায়াতের অনুপস্থিতির পরিস্থিতি দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য না বোঝার ফলে এমনি ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে একাধিক দলের সংগঠন যেনো ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর। এই দুই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক আনুগত্যের স্বরূপ ভিন্নতর তা ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ে রাসুলেপাকের সুন্নাহই হলো মূল দিশারী। রাসুলে পাকের কর্মপদ্ধতিই আমাদের কর্ম পদ্ধতি। রাসুলে পাকের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি গুলো চিরন্তন, কিন্তু মূলনীতি বাস্তবায়নের ধারা বিভিন্ন হতে বাধ্য। এমনি করে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা ও রাসুলের সুন্নাহ থেকেই নিতে হবে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন ও বিস্তারিত কর্মসূচীর প্রণয়ন চিন্তা ও গবেষণার উপর নির্ভর করে। তাই বিভিন্ন মতামত অপরিহার্য। তদুপরি বর্তমানের পরিবর্তিত জটিল রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যাগুলোর নিরিখে এ সব মূলনীতি সমুহের বাস্তবায়ন এবং বর্তমান বিশ্বে এসব বিষয়ের প্রয়োগ প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতা কর্মীদের বিচার বিবেচনাকে নাড়া দেবে। এক কথায় এখানে মত পার্থক্য থাকবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

**খিলাফাহর ধারণা ও সমকালীন বাস্তবতা (উদ্ধৃতিসহ)**

১. খিলাফাহর শারঈ ভিত্তি

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেন:

> "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমন করে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খিলাফত দান করেছিলেন..."
(সূরা নূর, ২৪:৫৫)

এ আয়াতে খিলাফাহকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি নেয়ামত ও দায়িত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি ন্যায়ভিত্তিক শাসনের ভিত্তি।

২. হাদীসে খিলাফাহ প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> "তোমাদের মাঝে খেলাফত থাকবে নবুওয়াতের পথ ও নিয়ম অনুযায়ী, তারপর তা রহমতপ্রসূ থাকবে... তারপর তা উঠিয়ে নেওয়া হবে।"
(মুসনাদে আহমদ: ১৮৪০৬)

এই হাদীস খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগকে "নবুওয়াতের পথে" খিলাফাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ভবিষ্যৎ খেলাফাহের আগমন সম্পর্কেও ইঙ্গিত করে।

৩. ঐতিহাসিক রেফারেন্স

খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন:

আবু বকর (রাঃ): বাইআতের মাধ্যমে উম্মাহর ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত

ওমর (রাঃ): শূরা বা পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত

ওসমান ও আলী (রাঃ): উম্মাহর সম্মিলিত সমর্থন ও দায়বদ্ধতায় শাসন

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফত: যদিও রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তবুও একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও ইসলামী শাসনের কাঠামো বহাল ছিল।

উসমানীয় খেলাফত: সর্বশেষ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খেলাফাহ যা ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হয়।

৪. বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য রূপ

খিলাফাহর মূল নীতিসমূহ আধুনিক কাঠামোতে নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনযোগ্য:

পরামর্শভিত্তিক শাসন (শূরা): গণতন্ত্রের ইসলামি বিকল্প

ইসলামী আইন ও ন্যায়: সংবিধানে শরীয়াহর মূলনীতি যুক্তকরণ

সামষ্টিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা: ওআইসি, D-8, GCC এর উন্নত সমন্বয়

৫. সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জ

উগ্র গোষ্ঠীসমূহ খেলাফাহর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। ইসলামে খেলাফাহ মানেই শুধু শারীরিক দখল নয়, বরং নৈতিক কর্তৃত্ব, ইনসাফ ও দায়িত্বশীল শাসন।

**খেলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য**

আল্লাহপাক হযরত আদম ও তার সন্তান সন্ততিদেরকে বিশ্বে খেলাফত প্রদান করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই খিলাফতের বিভিন্ন মর্ম ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ এসবগুলো মর্ম ও তাৎপর্যই এখানে প্রনিধানযোগ্য। নিচের আয়াতগুলোতে এসব মর্ম ও তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে।

এরসাদ হয়েছে;

و اذ قال ربك للملائكة الى جاعل في الأرض خليفة )البقرة - )٢٩(

(স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফিরিস্তাদের উদ্দেশে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বানাতে যাচ্ছি।)

আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে বনি আদমের দায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছে সুরা বাকারায় বর্ণিত আদম সৃষ্টির ও তাদেরকে বেহেশত থেকে বহিস্কার করার ঘটনার শেষের আয়াতে এভাবে,

فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هدى فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون و الذين كفروا و كذبوا بايتنا

اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون - )البقرة - )٢٩(

(অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার তরফ থেকে হিদায়াত আসবে, অতঃপর যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য ভীতও হবেনা বা অতীতের জন্য অনুশোচিতও হবে না। এবং যারা কুফুরী করবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তারা দোজখের অধিবাসী হবে এবং সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।)

ثم جعلنكم خلائف في الأرض من بعد هم لننظر كيف تعملون - )يونس - )١٣(

(অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি যেনো দেখি তোমরা কি ভাবে আমল করো, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ কি ভাবে করো, তাই দেখার জন্যেই তোমাদেরকে খলিফা বানানো হয়েছে।)

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره - )فاطر - )٣٨(

(সেই আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন, যারা এই নিয়ামতকে অস্বীকার করবে তাদেরকে তার পরিনতি ভোগ করতে হবে।)

(আমি اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدي الظالمين - )البقرة - ١٢٤( তোমাকে জনগণের নেতা বানাতে যাচ্ছি, ইব্রাহিম বললেন, আমার সন্তান সম্প্রতিদের জন্যেও কি এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে? আল্লাহ বললেন, জালেমদের কাছে আমার এই ওয়াদা পৌঁছুবে না।)

অর্থাৎ পরবর্তীযুগে জনগণের মধ্যে যারা সত্যাশ্রয়ী তারাই শুধু নেতৃত্বের হকদার হবে। যারা সত্যাশ্রয়ী নয় বা যারা জুলুম করবে তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়।
আল্লাহর এই ওয়াদা খোলাফায়ে রাশেদীনদের যামানায় অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে, এবং কোরআনের ব্যাপক প্রয়োগ পদ্ধতিতে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও এই ওয়াদা বহাল রয়েছে।

- الذين ان مكناهم فى الأرض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر

( الحج - ٤١) (এই সমস্ত লোক তারাই যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব প্রদান করি তবে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সুকৃতির নির্দেশ দেবে এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।)

এই আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় দায়ীত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। নামাজের প্রতিষ্ঠা, যাকাতের প্রচলন এবং সুকৃতির নির্দেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলোতে মুসলমানদের খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দায়ীত্বের কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

**খিলাফত ও ইমামতের অর্থ**

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে তাকে 'খিলাফত' বা 'ইমামত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, শরীয়তের পরিভাষায় দুইটি সমার্থক শব্দ হলেও মর্মে ও তাৎপর্যে ভিন্নতর। নামাজের ইমামতিকে ইমামত ও রাষ্ট্রের ইমামতিকেও ইমামতই বলা হয়। ইসলামের পন্ডিতেরা এই দু'য়ের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে নামাজের ইমামতকে 'ইমামতে ছোগরা' (ছোট ইমামতি) ও রাষ্ট্রের ইমামতকে 'ইমামতে কোবরা' (বড় ইমামতি) বলে অভিহিত করেছেন। ইমামতির অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্যে সার্বিকভাবে সামঞ্জস্য রয়েছে।
পক্ষান্তরে খিলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাপকতর,

খিলাফতের শাব্দিক অর্থে বলা হয়েছে;

. مصدر خلف يخلف خلافة :بقى بعده أو قام مقامه و كل من يخلف شخصا أخر يسمى خليفة لذلك سمى من يخلف الرسول في اجراء الاحكام الشرعية ورئاسة المسلمين في امور الدين والدنيا ( خليفة و يسمى المنصب خلافة وامامة - محيط المحيط

)মূল শব্দ )خلف( এর উৎস, এর অর্থ হলো যা পরে আসে (হলাভিষিক্ত হওয়া) কিংবা কারো প্রতিনিধিত্ব করা, যে ব্যক্তি কারো হলাভিষিক্ত হয় তাকে বলা হয় খলিফা, এ জন্যেই যিনি রাসুলের হলাভিষিক্ত হয়েছেন শরীয়তের বিধান চালু করার জন্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে মুসলমানদের নেতৃত্বে দিতে গিয়ে, এই পদকে বলা হয়েছে খিলাফত বা ইমামত।) এই খিলাফতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনে খলদুন বলেছেন;

- هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها ( مقدمة)

(জনসাধারনের পার্থিব ও আখেরাতের স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয় সমুহকে শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত করা।)

এ কথার ব্যাখা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

- فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين والدنيا - مقدمة ابن خلدون ص (١٩١)

(খিলাফত আসলে দুনিয়া ও আখেরাতের সংরক্ষণে রাসুলে আজমের প্রতিনিধিত্ব।)

এমনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সর্বকালের ও সর্বযুগের জন্যেই ফরজ। ইসলামের ইমামগণ

সুস্পষ্টভাবে এর অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তাহতাভী বলেছেন,

أجمعت الأمة على وجوب عقد الامامة و على أن الامة يجب عليها الانقياد لامام عادل ، يقيم فيهم احكام الله و يسوسهم باحكام الشريعة التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يخرج عن هذا الاجتماع من يعتد بخلافة - )حاشية الصحطاوي على الدر )١ /٢٣٨(

(মুসলিম উম্মাহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার প্রশ্নে এক মত, এটা ফরজ যে মুসলমানগণ একজন নিষ্ঠাবান নেতার আনুগত্য করবে, যিনি তাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসুলের বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সর্বসম্মত মতের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন মত নেই।

এখানে উল্লেখিত কোরআনে মজীদের আয়াত সমূহ ও বিভিন্ন ইমামদের মন্তব্যাদী থেকে স্পষ্ঠ হয়ে গেছে যে 'খিলাফত' শব্দের শাব্দিক অর্থে পার্থক্য থাকলেও ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থে কোন মত পার্থক্য নেই।

মুসলিম ঐক্যের একটি ঐতিহাসিক মডেল

খিলাফত শব্দটি এসেছে আরবি "খলিফা" (خليفة) শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো প্রতিনিধি বা উত্তরসূরি। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধি, যিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, বরং ইসলামী শরীয়তের ধারক-বাহক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন।

**খিলাফতের সূচনা**

খিলাফতের সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর। প্রথম চার খলিফাকে বলা হয় "খিলাফতে রাশিদা" বা "ন্যায়পরায়ণ খিলাফত"। তাঁরা ছিলেন:

1. আবু বকর (রাঃ)

2. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)

3. উসমান ইবন আফফান (রাঃ)

4. আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ)

এই যুগকে ইসলামী শাসনের আদর্শ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খিলাফতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

খিলাফতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সংহত ছিল।

বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মুসলিমরা একই শাসনতন্ত্রের আওতায় জীবনযাপন করত।

ইসলামী শরীয়ত পূর্ণরূপে কার্যকর ছিল।

জাকাত, হজ্ব, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি—সবকিছু পরিচালিত হতো ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে।

খিলাফতের বিলুপ্তি ও এর পরিণতি

১৯২৪ সালে তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তি মুসলিম বিশ্বে একটি বড় সংকট সৃষ্টি করে। এর পর মুসলিম দেশগুলো বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং উম্মাহর ঐক্য ভেঙে যায়।

খিলাফতের ধারণা ও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ

আজকের প্রেক্ষাপটে "খিলাফত" শব্দটি অনেক সময় রাজনৈতিক বিতর্ক বা মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তবে মূলধারার ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিম সমাজকে শরীয়তভিত্তিক ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে পরিচালনা করা এবং একটি একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাখা।

**খিলাফতের অনুপস্থিতিতে মুসলিম উম্মার করণীয়**

খিলাফতের বিলুপ্তির পর থেকে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যের অভাব ও নেতৃত্বহীনতায় পড়েছে। যদিও ঐতিহাসিক খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজকের জটিল বিশ্ব রাজনীতির কারণে কঠিন, তবুও মুসলিম উম্মার ঐক্যের জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। নিচে কয়েকটি করণীয় তুলে ধরা হলো:

১. ধর্মীয় ঐক্যের প্রচার

মাজহাবিক ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা তাদের মূল বিশ্বাস ও মৌলিক ধর্মীয় নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইসলামের আহকামে মোয়াহিদা (মুসলিমদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্যের আদেশ) পালন করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বাড়াতে হবে।

২. সংহত নেতৃত্বের বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি

যখন ঐতিহাসিক খিলাফত নেই, তখন বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা বা ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন—দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক মুসলিম লিগ, সম্মেলন বা ফোরাম, যেখানে সমন্বয় সাধন ও মতবিনিময় হবে।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে ঐক্য দৃঢ় করা যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যা দেশের সীমা ছাড়িয়ে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য নিশ্চিত করবে।

৪. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ

মুসলিম বিশ্বে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং ঐক্যের গুরুত্ব বোঝাতে হবে।

৫. রাজনৈতিক ঐক্য ও কূটনৈতিক সমন্বয়

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে তাদের স্বার্থ ও ইস্যুতে একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। পরস্পরের বিরোধ ও রাজনৈতিক মতবৈষম্য কমিয়ে ঐক্যবদ্ধ কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে মুসলিম উম্মার অবস্থান দৃঢ় করতে হবে।

খিলাফতের অনুপস্থিতিতে মুসলিম উম্মার ঐক্য রক্ষা এবং পুনর্গঠনের জন্য ঐতিহাসিক মডেলের বাইরে বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য। ধর্মীয় সমঝোতা, রাজনৈতিক সংহতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এমন এক সমন্বিত পথ যা মুসলিম উম্মাকে পুনরায় শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

## মায়ারূফ ও মনকার–

উলেমাদের এই মর্যাদার কারণে তাদের দায়িত্ব ও বেশী। যেহেতু দ্বীন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বেশী তাই তাদের দায়িত্বও বেশী। ভাল কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার কাজটি যদি ও সমস্ত মুসলমান নরনারীর জন্যে প্রযোজ্য, কিন্তু যেহেতু ইসলামের 'ভাল ও মন্দ (منكر و معروف কাকে বলে তা উলেমারাই ভাল করে জানেন, তাই এই কাজের দায়িত্ব ও কার্যতঃ উলেমাদের উপর এসে বর্তায়। ইসলামের দৃষ্টিতে যে সমস্ত কাজ ভাল বলে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত বা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে সমস্ত কাজ ভাল কাজ বলে সাধারনভাবে পরিচিত, সেগুলোই শরীয়তের দৃষ্টিতে সুকৃতি বা মারুফ, এর বিপরিতে যে সমস্ত কাজ নিঃ সন্দেহে গর্হিত বা মন্দ কাজ বা যা সাধারন ভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ কাজ বলে পরিচিত, তাকেই মন্দ বা মোনকার বলা হয়।

ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার কাজটি ইসলামী সমাজের জন্য মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে পরিগণিত। যে সমাজে এই দায়িত্বটি পালন করা হয় না সেটি ইসলামী সমাজের চরিত্র হারিয়ে ফেলে। সৎকাজের লালন ও অসৎকাজকে ঘৃণা করার পরিবেশ সৃষ্টি না হলে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোরআনে মজিদে এই মহান দায়িত্বটিকে যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা একটু গভীর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে ইলমের যেমন দুইটা পর্যায় রয়েছে, যার একটি হলো সাধারন ভাবে সকল মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ আর অন্য পর্যায়টি হলো ইলমের সংরক্ষণ যা উলেমাদের দায়িত্ব। দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলম সবার প্রতি ফরজ নয় ও বাস্তবে সম্ভব ও নয়। তেমনি সুকৃতির নির্দেশ ও দুষ্কৃতির নিষেধের ও দুইটি পর্যায় রয়েছে। একটি হলো সাধারনভাবে প্রতিটি মুসলমানদের প্রতি ফরজ। প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। এই দায়িত্বের প্রকৃতি ও ধরন ভিন্নতর। যাকে হাদীসে বলা হয়েছে এ ভাবে,

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع و هو مسئول عن رعيته ، و المرأة راعية في بيت زوجها و هي مسئولة عن رعيتها و الولد راع فى مال ابيه ، و هو مسئول عن رعيته ، و العبد راع في مال سيده ، و هو مسئول عن رعيته ، الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن

رعيته - )متفق عليه(

(তোমাদের প্রত্যেকই শাসক (রক্ষক) এবং তোমাদের সবাই তার শাসিতদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল, জনগণের শাসক তার প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল, স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর উপর

দায়িত্বশীলা, সে তার রক্ষক, সন্তান তার পিতার অর্থের উপরে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিঙ্গাসাবাদ করা হবে। দাস তার প্রভূর সম্পদের রক্ষক, সে এর দায়িত্বশীল। অতঃপর তোমরা সবাই শাসক (রক্ষক) এবং তোমাদের সবাইকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিঙ্গাসাবাদ করা হবে।) বোখারী ও মুসলিম।

দায়িত্বের এই প্রাকারভেদে সুকৃতির নির্দেশ ও দুষ্কৃতির নিষেধ কার্যকরী। জ্ঞান, যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে এই দায়িত্বের শ্রেণী বিন্যাস করা হবে। উপরের হাদিসে এই দায়িত্বের প্রকারভেদ সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে প্রতিটি মানুষের যোগ্যতা সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। আল্লাহ পাকের এই নীতি এখানে প্রযোজ্য;

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - )البقرة(

(আল্লাহপাক কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়ী করবেন না)

যাও।)

কোরআনে সমাজে তিনটি শ্রেণীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (১) সীমা লংঘন কারী ও বিদ্রোহী শ্রেণী (২) আল্লাহর আদেশ নিষেধের অনুসরন কারী কিন্তু অপরাধীদের বিরূদ্ধে নীরব ও তাদের প্রতি আল্লাহর গজবের প্রত্যাশী (৩) অপরাধীদের বিরূদ্ধে সোচ্চার মুমেনদের শ্রেণী। উপরোক্ত আয়াতে শুধু তৃতীয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আজাব থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নীরব ইমানদারদেরকে এই আজাব থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়নি। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আজাবে গ্রেফতারের কথা বুঝা যায়। তবে কোন কোন তফসীরের ব্যাখানুযায়ী আজাব শুধু প্রথম শ্রেণীর জন্যে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ নীরব রয়েছেন।

মত-পার্থক্য যাই থাকুক না কেন। আয়াতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে আজাব থেকে রক্ষা করা হয়েছে শুধু মাত্র সুকৃতির নির্দেশ দাতা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কারীদেরকে। অন্যায়ের বিরূদ্ধে নীরব মুমেনদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে কিনা তা বলা হয়নি। আজ ও ইসলামের এই শিক্ষা বলবৎ। এই দায়িত্ব পালন না করার এই দুর্বিসহ অবস্থা কোন মুমিন মেনে নিতে পারেনা। আলেমগণ যদি এই দায়িত্ব পালন না করেন তবে সমাজের এই ভয়াবহ পরিনাম থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। উপরের আলোচনা থেকে এই কথাটি আর ব্যাখার প্রয়োজন রাখেনা যে মারুফের নির্দেশ ও মুনকারের প্রতিরোধ বলতে শুধু ইসলামের কতিপয় মৌলিক ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াত দেয়াই বোঝায় না। সুরা তওবা ও সুরা হজ্বের আয়াত দুটিতে 'নামাজ কায়েম করা' 'যাকাত প্রদান করা' ও 'শরীয়ত নির্ধারিত সীমা সংরক্ষনের' দায়ীত্বের সাথে সাথে মায়ারুফের নির্দেশ ও মুনকারের প্রতিরোধের কথাটিকে স্বতন্ত্র ভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর অর্থ ইসলামের মৌলিক ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াতই শুধু নয়। বরং দ্বীনের সার্বিক বিষয়গুলোর সামগ্রিকতায় সমাজে ন্যায়ের পালন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এর মূল লক্ষ্য। এই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। যারা কতিপয় ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াত কেই এই দায়িত্বের প্রতিপালন মনে করেন তারা আত্ম প্রবঞ্চনা করেন মাত্র। ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে এই দায়িত্ব পালন না করলে এই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাবার কোন উপায় নেই।

সমাজের তৃতীয় শ্রেণীটি হলো দেশের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত আপামর জনসাধারন। তারা পার্থিব বিষয়গুলোতে প্রথম শ্রেণীর লোকদের উপর এবং ধর্মীয় বিষয়গুলোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা উলেমাদের উপর নির্ভরশীল।

জনশক্তির এই মূল্যায়নে প্রতিভাত হয় যে দেশে ইসলামী আর্দশবাদের প্রতিষ্ঠা ও লালনের জন্যে উলেমা শ্রেণীর ভূমিকাই চাবিকাঠি। উলেমাদের কারণেই আজকের অবস্থা এবং তারাই এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারেন।

## কেন আজ মুসলিম উম্মার মাঝে এতো বিভেদ?

মুসলিম উম্মা, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠী, যার ভিত্তি কোরআন ও নবী সা.-এর সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল, ছিল একসময়ে ঐক্যবদ্ধ একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়। তবে আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে মুসলিম সমাজের মধ্যে অসংখ্য বিভেদ, মতবিরোধ, গোষ্ঠীবাদ এবং বিভাজন। এই বিভেদের কারণ গুলো নানা মাত্রার এবং বহুমাত্রিক। ইসলাম শিখিয়েছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবতা অন্যরকম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে গভীরতর বিশ্লেষণ জরুরি।

### ১. কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে ঐক্যের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো, সমস্ত দল হয়ে ভাগ হয়ে যাও না।"
(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩)

এ আয়াত স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে মুসলিম উম্মার একতা একটি ইমানি আদর্শ। নবী (সা.) বলেছেন:

"মুমিন এক দেহের সদৃশ; যদি এক অংশে কষ্ট হয়, সারা দেহ কাঁদে।"
(সহীহ মুসলিম)

এই দুই বাণী থেকে পরিষ্কার যে, ঐক্য ইসলামের অন্তর্নিহিত গুণ। কিন্তু বিভেদের কারণগুলো কোথায়?

**২. অহংকার ও গোষ্ঠীবাদের জন্ম**

মানব জাতির মাঝে অহংকার একটি প্রকৃতিগত প্রবণতা। মুসলিম উম্মার মাঝে গোষ্ঠীবাদ ও জাতিগত অহংকারের কারণে বিভেদ বাড়ে। কোরআন এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন:
"অন্ততঃ ভয় কর যারা তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তোমাদের প্রথম সৃষ্টির মত অংশ ভাগ করে দেয়।"
(সূরা আল আনফাল, আয়াত ৪৭)

মানুষ নিজের সম্প্রদায় বা জাতিকে অন্যদের থেকে উঁচু মনে করে, যা বিরাট বিভেদের কারণ। এ ধরনের অহংকার ইসলামের মূল আদর্শের পরিপন্থী।

**৩. মাজহাবিক পার্থক্য ও মতপার্থক্যের অতিরঞ্জন**

ইসলাম নানা মাজহাবকে অনুমোদন করেছে, কারণ মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মত রাখতে পারে। তবে যখন মাজহাবিক পার্থক্য বিদ্বেষ ও বিদ্বেষবাদে রূপ নেয়, তখন তা উম্মার জন্য বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবী (সা.) এর এক হাদিসে আছে:
"আমার উম্মা সাত ভাগে ভাগ হবে, এবং তাদের মধ্যে যারা জান্নাতে যাবে তা খুবই কম।"
(সহীহ বুখারি)

এটি পূর্বাভাস হলেও ইসলামে ঐক্যের প্রচেষ্টা কখনো থামে না। উম্মার ঐক্যের জন্য সম্মান ও সহিষ্ণুতা অপরিহার্য।

**৪. রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব**

বিভেদের অন্যতম বড় কারণ হলো ক্ষমতার লোভ। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী সৎ ও ন্যায়পরায়ণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতায় অনেক মুসলিম দেশে ক্ষমতার লোভ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্ররা ঐক্যবদ্ধ সমাজকে নষ্ট করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করবেন না, যেন তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো।"
(সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ৯)

রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিমরা একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, যা ইসলাম বিরোধী এবং উম্মার ক্ষতির কারণ।

### ৫. বিদেশী ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপ

ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, বিভিন্ন বিদেশী শক্তি মুসলিম উম্মাকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছে। ১৯-২০ শতকে কলোনিয়াল শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ ছড়িয়েছে। আল্লাহ বলেন:
"তারা নিজেদের মাঝে বিভাজন ঘটিয়েছে।"
(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৪)

আসলে, উম্মার ঐক্য নষ্ট করার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ছায়া।

### ৬. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

মুসলিম উম্মা বিশ্বের নানা জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষার সমন্বয়ে গঠিত। তবে কখনো কখনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক পার্থক্য ধর্মীয় ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পরিষ্কার করে দিয়েছে:
"অন্ততঃ ভয় কর তোমাদের মাঝে যিনি সর্বাধিক ধার্মিক।"
(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)

অর্থাৎ, ঈমান ও ধার্মিকতা জাতীয় গণ্ডি অতিক্রম করে উম্মার আসল ঐক্যের মাপকাঠি।

মুসলিম উম্মার বিভেদ স্বাভাবিক নয়, বরং একটি মানবিক দুর্বলতা যা ঈমান ও ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত। কোরআন-হাদিসের শিক্ষায় স্পষ্ট যে, ঐক্য বজায় রাখা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। অহংকার, গোষ্ঠীবাদ, রাজনৈতিক স্বার্থ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিদেশী ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের মূল ভিত্তি — একতা, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সবাইকে কাজ করতে হবে। নবী (সা.) বলেছেন:
"ইসলামের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলো যারা উম্মার জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।"
(তিরমিযী)

সুতরাং, আজকের বিভেদের শিকল ভেঙে উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করে মানবতার কল্যাণে ইসলামের সঠিক পথ অনুসরণ করাই সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মুসলিম উম্মা আজ গভীর বিভাজন ও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। মাঝে মাঝে এই বিভাজনকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, "বিধর্মীরা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে" বা "বিধর্মীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই উম্মা একত্র হতে পারছে না।" এ ধরণের ব্যাখ্যা অনেকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু সত্যি কি বিধর্মীদের পাতা ফাড়ার কারণে মুসলিম উম্মার বিভাজন? নাকি এর পেছনে আরও গভীর ও জটিল কারণ রয়েছে?

### ১. বিধর্মীদের ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা

ইতিহাস ও বাস্তবতায় কিছু নিঃসন্দেহে সত্য যে, বাইরের শত্রুরা মাঝে মাঝে মুসলিম সমাজের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে চায়। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন শক্তি মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। যেমন কলোনিয়াল আমল, বিভিন্ন বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা এসব করেছে।
কোরআনে আল্লাহ বলেন:
"তারা নিজেদের মাঝে বিভাজন ঘটিয়েছে।"
(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৪)

তবে এই আয়াতের অর্থ শুধুমাত্র বাইরের হস্তক্ষেপ নয়, উম্মার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকেও নির্দেশ করে।

### ২. উম্মার অভ্যন্তরীণ কারণগুলো অগ্রাহ্য করা কঠিন

বহু ক্ষেত্রে উম্মার বিভাজন নিজস্ব ভুল, অহংকার, গোষ্ঠীবাদ, স্বার্থপরতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে ঘটে। যদি উম্মা নিজেই ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে বাইরের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতো না। নবী (সা.) বলেছেন:
"মুমিনরা এক দেহের সদৃশ; যখন শরীরের একটি অংশ ব্যথা পায়, সারা শরীর কাঁদে।"
(সহীহ মুসলিম)

এখানে স্পষ্ট যে, উম্মার অভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাব বাইরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বড় বাধা।

### ৩. বাইরের প্ররোচনা আর উম্মার দুর্বলতার মিলিত প্রভাব

বিধর্মীদের পাতা ফাড়ার ষড়যন্ত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু এটি কার্যকর হতে পারে শুধু যখন উম্মার ভেতরেই বিভেদ ও দুর্বলতা থাকে। অর্থাৎ, বাইরের ষড়যন্ত্রগুলো উম্মার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। কোরআনে বলেছে:
"তারা ভাগাভাগি হয়েছে এবং তারা সর্বত্র ফাটল সৃষ্টি করেছে।"
(সূরা আল আনফাল, আয়াত ৫৩)

এই ফাটলগুলো আসলে উম্মার নিজস্বই, যেগুলো বাইরের প্ররোচনা জোরদার করে।

### ৪. ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যা ও মিসইনফরমেশন

আজকের বিভেদের এক বড় কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি ও মিথ্যা প্রচার। কিছু গোষ্ঠী নিজের মতবাদকে একমাত্র সত্য মনে করে অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়ায়। এটি বাইরের ষড়যন্ত্রের চাইতেও বেশি ক্ষতিকর।
নবী (সা.) বলেছেন:
"যারা আমার উম্মাকে বিভক্ত করে, তাদের উপর আমার অভিশাপ থাকবে।"
(সহীহ মুসলিম)

এই ধরনের বিভাজন উম্মার আত্মহননের মতো।

### ৫. ঐক্যের জন্য উম্মার নিজস্ব প্রচেষ্টা অপরিহার্য

বাইরের কোনো শক্তি যদি উম্মাকে একত্রিত দেখতে চায়, তাহলে তাকে বাধা দেয়া উম্মার নিজস্ব উদ্যোগেই। অর্থাৎ, উম্মাকে নিজের ভুলগুলো ঠিক করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহ বলেন:
"আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো, সমস্ত দল হয়ে ভাগ হয়ে যাও না।"
(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩)

এটা আমাদের স্পষ্ট নির্দেশনা, ঐক্যের পথেই মুক্তি।

সুতরাং, বিধর্মীদের পাতা ফাড়ার ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মুসলিম উম্মার বিভাজনের মূল কারণ শুধু তা নয়। উম্মার ভেতরের অহংকার, স্বার্থপরতা, গোষ্ঠীবাদ, রাজনৈতিক দাঙ্গা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বহুতল কারণ। বাইরের ষড়যন্ত্রগুলো কার্যকর হতে পারে শুধু যখন উম্মা ঐক্যহীন এবং দুর্বল থাকে। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য উম্মাকে প্রথমে নিজস্ব ভুলগুলো

চিহ্নিত করে সংশোধন করতে হবে, কোরআন-হাদিসের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ঐক্য ছাড়া মুসলিম উম্মার মুক্তি ও শক্তি কখনো সম্ভব নয়।

**মুসলিম উম্মাহর বিভাজনে লাভবান কারা?**

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের শক্তি ও সম্মানের প্রতীক। কিন্তু ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন, দ্বন্দ্ব এবং মতপার্থক্য বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাজন শুধু মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতাই বাড়ায়নি, বরং কিছু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তিকে লাভবান করেছে। এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব, মুসলিম উম্মাহর বিভাজনে কারা লাভবান হচ্ছে এবং এর পেছনের কারণগুলো কী।বিভাজনের প্রেক্ষাপটমুসলিম উম্মাহর বিভাজনের শিকড় ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কারণে গভীরভাবে প্রোথিত। শিয়া-সুন্নি বিভেদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও মতবাদ এই বিভাজনকে আরও জটিল করেছে। এই বিভাজনের ফলে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, যা বিশ্ব মঞ্চে তাদের প্রভাব কমিয়ে দিয়েছে।লাভবান শক্তিমুসলিম উম্মাহর বিভাজনে কারা লাভবান হচ্ছে, তা বোঝার জন্য আমাদের কয়েকটি প্রধান শক্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন:
১. বৈশ্বিক শক্তি ও পশ্চিমা দেশগুলোবিশ্বের প্রভাবশালী শক্তি, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো, মুসলিম উম্মাহর বিভাজন থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, "বিভাজন ও শাসন" (Divide and Rule) নীতির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম ভূখণ্ডে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তাদের জন্য ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ:তেল ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ: মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন পশ্চিমা দেশগুলোকে তেলের বাজার এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সহায়তা করে।অস্ত্র ব্যবসা: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা অস্ত্র বিক্রির বাজারকে উৎসাহিত করে। পশ্চিমা দেশগুলো এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করে।রাজনৈতিক প্রভাব: বিভাজনের কারণে মুসলিম দেশগুলো একক শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, ফলে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নীতি ও স্বার্থ আরোপ করতে সক্ষম হয়।
২. আঞ্চলিক শক্তিমুসলিম উম্মাহর বিভাজনের ফলে কিছু আঞ্চলিক শক্তিও লাভবান হয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে:প্রতিটি দেশ তাদের মিত্রদের সমর্থন দিয়ে আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।প্রক্সি যুদ্ধ (যেমন ইয়েমেন, সিরিয়া) এই বিভাজনকে আরও তীব্র করে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাদের প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ পায়।

৩. চরমপন্থী গোষ্ঠীমুসলিম উম্মাহর বিভাজন চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর জন্যও সুযোগ তৈরি করে। এই গোষ্ঠীগুলো ধর্মীয় মতপার্থক্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

৪. অভ্যন্তরীণ স্বার্থপর গোষ্ঠীমুসলিম সমাজের মধ্যে কিছু অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভাজনকে উৎসাহিত করে। এর মধ্যে রয়েছে:দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতারা, যারা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখে।ধর্মীয় নেতারা, যারা নিজেদের মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বিভাজনকে প্রশ্রয় দেয়।বিভাজনের পরিণতিমুসলিম উম্মাহর বিভাজনের ফলে শুধু বাহ্যিক শক্তিই লাভবান হয় না, বরং মুসলিম সমাজ নিজেই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, শিক্ষার অভাব, সামাজিক অস্থিরতা এবং সাংস্কৃতিক পতন এই বিভাজনের অনিবার্য ফল। এই বিভাজন মুসলিম উম্মাহর সম্ভাবনা ও শক্তিকে দুর্বল করে এবং তাদের বিশ্ব মঞ্চে প্রভাব হ্রাস করে।

# অতঃপর ঐক্যের পথে

উলেমাদের ঐক্য ও ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্নমূখী আন্দোলনের ঐক্য হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পথে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ। এই পরম বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে যা অপরিহার্য তা হলো সকল পর্যায়ের নেতৃত্বের ও
কর্মীদের মধ্যে মনস্তাত্বিক বিপ্লব ঘটানো। নিজেকে বা নিজের দলকে অন্যের বা অন্যদলের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করার অহম ত্যাগ করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা দলীয় বিনয় অনেক অবাঞ্ছিত বিরোধ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এখানে কিছু দেয়ার প্রয়োজন নেই, কোন বস্তুগত স্বার্থ ত্যাগ করারও দরকার নেই, প্রয়োজন হলো মনের সংকীর্ণতা থেকে দূরে থেকে উদার মনের পরিচয় দেয়া। এই আত্মত্যাগের ফলে সে ব্যক্তি বা সে দল অন্যের কাছে মহান হয়ে যায়। পূর্বের শত্রুতা বা ঘৃণা আস্তে আস্তে চরম ও পরম আপনজনে পরিণত করে দেয়। কোরআনে মজিদের এই আয়াতের তাৎপর্য এটাই,

. ادفع بالتي هي أحسن .فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم

"সুন্দরতম আচরণ দিয়ে মন্দ বা অশালীন আচরণকে প্রতিহত করো, তার পরিণামে হটাৎ করেই পুঞ্জিভূত শত্রুতা চরম বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে যাবে।" বিশ্বের অপরাপর ধর্ম, আদর্শ ও মতবাদ সমূহের সাথে ইসলামের স্বাতন্ত্রই এখানে যে এই আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ সত্যিকার অর্থে ভাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি মোড়ে আমরা এর নিদর্শন দেখতে পাবো। মুসলমান বলে পরিচিত হবার জন্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্বতা ঘোষণা করা অপরিহার্য শর্ত। মুসলিম বলে পরিচিত হবার সাথে সাথেই ভাতৃত্বের এই মৌলিকগুণ তার পরম দায়িত্ব এ অধিকারে পরিণত হয়ে যায়। সে কোন অবস্থাতেই এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যেতে পারে না এবং তার এই অধিকার থেকেও তাকে কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত করা যাবে না। হাদীস শরীফে এরসাদ হয়েছে;

عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :امرت ان القاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فاذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبحتنا وصلوا صلواتنا فقد

حرمت علينا دمائهم وأموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم )رواه النسائي (

(আমাকে নির্দেশ দেয়া সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ যখন তারা এই সাক্ষ্য হয়েছে যে মানুষদের সাথে আমি লড়তে থাকবো যতক্ষণ না তারা ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। অতঃপর দেবে, এবং আমাদের কিবলাহকে কিবলা মেনে নেবে, এবং আমাদের জবাই করা

পশু খাবে এবং আমাদের মতো নামাজ পড়বে, তবে তাদের জান ও মাল আমাদের উপর হারাম হয়ে যাবে, অবশ্য কোন নির্ধারিত হক এর থেকে স্বতন্ত্র (কিসাম ইত্যাদি) তার জন্যে সেই অধিকার যা অপরাপর মুসলমানদের অধিকার, তার দায়িত্ব ও তাই যা অপরাপর মুসলমানদের দায়িত্ব।)

একজন মুসলামানের মান-মর্যাদা, আত্মসম্মান তার নিজস্ব মান-মর্যাদা বা আত্মসম্মানেই শুধু পরিনত হয়ে যায়না, বরং নিজের মর্যাদার চাইতে ও তার ভায়ের মর্য্যাদা তার কাছে অগ্রাধিকার পায়। এই অধিকার দল মত ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের জন্যে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলাবাহুল্য, এই কর্তব্য-দায়িত্ব ও অধিকারের প্রয়োগ সম্পে নিরীক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের হাতে রেখেছেন।

হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে;

عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ما من أمرى يخذل امرا مسلما في موضع تنتهك فيه و ينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته و ما من امـرى ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه و ينتهك من حرمته الا نصره الله في مواطن يحب فيه نصرته رواه ابو داؤد )

যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন অবস্থানে সমর্থন করে না, যেখানে তাকে হেয় করা হচ্ছিল এবং তার সম্মানের উপর আঘাত করা হচ্ছিল, তবে আল্লাহ পাক ও তাকে এমন অবস্থানে সাহায্য করবেন না। যেখানে সে তাঁর সাহায্য একান্ত ভাবে কামনা করে। যদি কোন মুসলমান এমন অবস্থায় কোন মুসলমানকে সাহায্য করবে যেখনে তার সম্মা আঘাত করা হচ্ছিলো এবং তার মর্যাদাহানী করা হচ্ছিলো, তবে আল্লাহ তাকে এমন অবস্থানে সাহায্য করবেন যেখানে তার নিতান্ত আকাংখা হবে যে আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন।

কোন ব্যক্তির মান-মর্যাদার চাইতে মূল্যবান কোন সম্পদ নেই। পরিস্থিতি ও অবস্থার নাজুকতাকে ব্যবহার করে, কারো ক্ষণিকের দূর্বলতা ব্যবহার করে কারো মান-মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিরাট অপরাধ।

রাজনৈতিকভাবে ও মুসলমানের এই হক হরণ করা যাবে না। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা এক দলের সাথে অন্যদলের সম্পর্কের অবনতির জন্যে এটাই মূল কারণ। মুসলমানদের এই মৌলিক অধিকারকে হরণ করা বা মুসলমানদের এই মৌলিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা কোন সাধারণ অপরাধ নয়। প্রকারান্তরে এর অর্থ হলো ইমানের পথ ছেড়ে কুফরীর পথে চলা। এরসাদ হয়েছে:

الا فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض - )متفق عليه (

(সাবধান হয়ে যাও, আমার পর কাফিরদের মতো হয়ে যেওনা যে একে অপরের গলা কাটতে থাকো।)

অন্য একটি হাদীসে এরসাদ হয়েছে:

عن عبد الله عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :المومن تكافاء دمائهم و هم يد على من سواهم )مسند ابو داود (

(মুমেনের রক্ত সমমর্য্যাদার অধিকারী এবং মুমেনগণ অন্যদের মোকাবিলায় একটি হাতের মত (ঐক্যবদ্ধ)

আর একটি হাদিসে বলা হয়েছে:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلم لا يظلمه و لا يسلمه و من كان فى حاجة اخيه كان الله في حاجته و من فرج عن رج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
(در بحاري والمسلم

(একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই, না সে তার উপর জুলুম করে আর না তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে। যে ব্যক্তি তার ভায়ের সাহায্যে লিপ্ত হলো আল্লাহ তার সাহায্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তার দোষ-এটি গোপন করবেন।)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :المسلم من سلم المسلمون

(من لسانه و يده - رواه البخاري

(মুসলমান সেই ব্যক্তি যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে।) عن أبي
موسى الاشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :المؤمن للمومن كا البنيان يشد

بعضه بعضا - )متفق عليه(

(মুমেন অন্য মুমেনের জন্য ঐ প্রাচীরের মতো যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।)

:عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال

مثل المومنين في توادهم و يراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر

الجسد بالسهر والحمى )رواه البخاري و المسلم(

(মুমেনদের উপমা পারস্পরিক আন্তরিকতা, করুনা ও সহযোগিতায় একটি দেহের মতো, যার একটি অঙ্গ যদি ব্যাথা পায় তবে সারা শরীর ঐ ব্যাথার কারণে বিনিদ্র ও জরাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।)

: عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل ان كان مظلوما تنصر و ان كان ظالما كيف ننصره فقال
تجبره أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره )رواه البخاري (

(আল্লাহর নবী বললেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মজলুম, তখন একজন বললো, যখন সে মজলুম তাকে আমরা সাহায্যে করি, কিন্তু যদি জালেম হয়, তাকে কি ভাবে সাহায্যে করবো? আল্লাহর নবী জবাবে বললেন, তাকে জুলুম করা থেকে প্রতিহত করো, বাঁধা দাও, এটাই তাকে সাহায্য করা।)

কোরআনে মজিদ মুমেনদের এই বিশেষ সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, এরসাদ হয়েছে:
انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم - اتقوا الله لعلكم ترحمون )الحجرات )٩(

(মুমেন একে অন্যের ভাই, এই জন্যে ভাইদের মাঝে সম্পর্ককে ঠিক করে নাও, আল্লাহকে ভয় করো- তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত হবে।)
এই বিষয়ের উপর কোরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহের কোন সীমা নেই। এই বই এর প্রথম দিকে ও এ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা কে না জানি যে ঐক্যেই শক্তি, বিরোধে শক্তির অপচয় হয়, সব চেয়ে বেশী ক্ষতি এই যে বিরোধের মাঝে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়না, অনেক সময় তাঁর অ নাযিল হয়। যদি

প্রত্যেকই চিন্তা করেন যে বিরোধ এড়িয়ে ঐক্যের পরিবে আমারই দায়িত্ব। অন্যের ভূমিকার উপর এটা নির্ভর করেনা, এটা নিতান্ত আং তবে বিরোধের আগুন ধীরে ধীরে নিতে যায়।

কোরআনে মজিদে এই দর্শনই তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে;

কোরআনে মজিদে এই দর্শনই তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে; اطيعوا الله ورسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و أصبروا ان الله مع الصابرين .

( الانفال) (আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার রাসুলের। কলহে লিপ্ত হয়ো না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ চলে যাবে এবং তোমরা এ পথে ধৈর্য্য ধারণ করবে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।)

অর্থাৎ সবরের সাথে কাজ করলে সূফল পাওয়া যায়। ফলে ঐক্যের পথ সহজ হয়ে যায়।

অহম ত্যাগ করা খুবই কঠিন কাজ। প্রত্যেক মানুষের মনেই নিজেকে বড় মনে করার অদম্য আগ্রহ রয়েছে। কেউ এর বাইরে নয়। কিন্তু এই মনোস্তাত্বিক বাধা অতিক্রম করে অহম ত্যাগ করতে পারলে যে সম্পদ অর্জিত হয় তার নাম ঐক্য। এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঐক্য অর্জিত হয় অতঃপর হারানোর চাইতে পাওয়াই মহত্তর হয়ে উঠে। ঐক্যের পূর্বে সে একজন মাত্র, কিন্তু ঐক্যের পর সে একটি জাতি বা উম্মাহ। এই

উম্মাহই আল্লাহর কাম্য।

ঐক্যের জন্যে নিচের দুইটি কথা মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিতে হবে।

প্রথমতঃ- আমার নিজের কর্মনীতি-কর্মপদ্ধতি বা আমার দলের কর্ম পদ্ধতি কোন ঐশী বাণী নয়। এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তম তাই সেই মোতাবিক কাজ করি। ভুলের সম্ভাবনা আছে বলে বাড়াবাড়ি করি না। সবিনয় কাজ করে যাই মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ- অন্য ব্যক্তি বা অন্য দলের কর্মসূচীর চাইতে আমার বা আমাদের কর্মসূচী উততম, তাই বলে অন্য ব্যক্তি বা দলের কর্মসূচীকে ঘৃণা করি না, কারো বিরূদ্ধে বিদ্বেষ রাখি না। তাদের কর্মসূচী হয়তো বা উত্তম।

উম্মতের ঐক্যের জন্য" আমাদের করণীয়–

আলহামদুলিল্লাহ, উম্মতের
ঐক্য" নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানলাম। এবার সবচেয়ে বড় কথা হলো এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

আল্লাহ আমাদের ২ টা চোখ দিয়েছেন। যদি একচোখ দিয়ে নিজের দোষ দেখি আর অপর চোখ দিয়ে অন্যের গুণ দেখি তাহলেই এই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যায়। আর যদি এক চোখ দিয়ে অন্যের দোষ দেখি আর এক চোখ দিয়ে নিজের গুণ দেখি তবেই এই পৃথিবীটা হয়ে যাবে অসুন্দর।

এমন কোন ব্যাক্তি নাই বা এমন কোন দল নেই যার মধ্যে" কোন ভাল গুণ নাই। আবার ঠিক একই ভাবে প্রতিটা দলেই কিছু খারাপ বিষয়ও চোখে পড়বে। আমরা যদি ভালো গুণ দেখার অভাস করি তবে অবশই সব জায়গায় ভালো বিষয় দেখতে পাবো।

## উম্মতের ঐক্যের জন্য আমাদের করণীয়

একবার একজন শিক্ষক এক যায়গায় অনেকগুলো কাচের গ্লাস রাখলেন যার সবগুলো পানি দিয়ে ভর্তি ছিল কিন্তু একটার অর্ধেক ভর্তি ছিল। ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হলো এই দুই ধরনের গ্লাসের ভিতর কি পার্থক্য" দেখতে পাও। সবাই বললো সবগুলো গ্লাস ভরা আর একটি গ্লাস খালি।

তখন শিক্ষক বললো বিষয়টা এভাবে না দেখে যদি এভাবে দেখা হতো। এই গ্লাসটি খালি নয় বরং এই গ্লাসটির অর্ধেক পানিতে পূর্ণ রয়েছে। তবে কতই সুন্দর হতো। আমরা যদি কারও দোষ গোপন করি কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহও আমাদের দোষকে গোপন করে রাখবেন।

## উপসংহার

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) করে সৃষ্টি করেছেন— "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (বাকারা ২:৩০)—এবং সেই প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত হিসেবে উম্মাহকে ঐক্যের বিধান দিয়েছেন— "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا" (আলে-ইমরান ৩:১০৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নসিহতকে সুনির্দিষ্ট নীতিতে পরিণত করেন মদীনার সনদ, "ঐক্য-ভিত্তিক মিল্লাত" ধারণা ও মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এই গবেষণার প্রত্যেকটি আলোচনা প্রমাণ করেছে যে ঐক্য কখনো কেবল বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ছিল না; বরং তা তাওহিদি দৃষ্টিভঙ্গি, তাকওয়া-নির্ভর চরিত্র গঠন, ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, জ্ঞান-প্রণোদিত সংস্কৃতি এবং ইসার (পরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার)—এই পাঁচ স্তম্ভের অখণ্ড সমন্বয়। যখন-ই এই সমন্বয় টেকসই হয়েছে, তখন-ই উম্মাহ 'খাইর উম্মাহ' হয়ে বিশ্বসভ্যতাকে ন্যায়, করুণা ও আলোকিত জ্ঞানের স্বাদ দিয়েছে; আর যখন-ই ভাঙন ধরেছে, তখন দ্বন্দ্ব, নিপীড়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

১. আধ্যাত্মিক পূর্বশর্ত

তাওহিদ—সর্বশক্তি আল্লাহ্‌র; মানুষ কেবল দায়িত্বশীল খাদেম। এর বোধ জাতিগত অহংকার আর ক্ষমতার লোভকে বিনষ্ট করে 'ঈমানভিত্তিক নাগরিকত্ব' গড়ে তোলে।

তাকওয়া—আল্লাহ্-ভীতি ও আত্মসংযম ব্যক্তিকে স্বচ্ছতা, আমানাহ ও ইনসাফে অটল রাখে; রাষ্ট্রশাসনে এটি দুর্নীতি-দমন ও নৈতিক অর্থনীতির ভিত্তি।

ইখলাস ও ইসার—নষ্ট স্বার্থপরতা নিঃস্বার্থ সেবায় রূপান্তরিত হয়; জাকাত, ওয়াক্‌ফ ও সাদাকাহ-কেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা-জাল গড়ে উঠে।

শূরা—ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (শূরা ৪২:৩৮); অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়া যুব ও নারীর অন্তর্ভুক্তিকে নিশ্চিত করে।

২. জ্ঞান ও প্রযুক্তির পুনর্জাগরণ

ইবনে রুশদ, আল-বিরুনী বা ফাতিমা আল-ফিহরীর উত্তরসূরিরা আজ প্রযুক্তিনির্ভর 'ওমরিয়াহ্ নলেজ নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলতে পারেন—যেখানে ওপেন-সোর্স গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পরিবেশ-বিজ্ঞান একত্রে উম্মাহর মেধা-সম্পদকে বর্ধিত করবে। ইলম-কেন্দ্রিক ঐক্য ইতিহাসে 'বায়তুল-হিকমাহ' সৃষ্টি করেছিল; বর্তমানে তা হতে পারে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সুপার-ক্লাস্টার এবং ইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরির মাধ্যমে জ্ঞান-সাধনার সড়ক।

৩. অর্থনৈতিক ইনসাফ ও যৌথ সমৃদ্ধি

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আধুনিক যন্ত্র—সুকূক, হালাল শিল্প-চেইন, ত্রিপক্ষীয় ওয়াক্‌ফ-ফান্ড, শারিয়া-অনুমোদিত ক্রাউড-ফাইন্যান্স—দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও শিক্ষাবৈষম্য দূর করতে পারে। নববী সমাজে 'মুয়াখাত্'-এর মাধ্যমে সম্পদ-পুনর্বণ্টন যে ইনসাফের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, আজ তা প্রযুক্তি-সহায়ক 'জাকাত-ইনোভেশন প্ল্যাটফর্ম'-এ রূপ নিয়ে বৈশ্বিক দারিদ্র্য-বিরোধী মডেল হতে পারে।

৪. কূটনৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব

গাজা, কাশ্মীর, ইয়েমেন, সুদান বা আরাকান—প্রতিটি নিপীড়িত ভূখণ্ড উম্মাহর সম্মিলিত বিবেকের পরীক্ষা। "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" (হুজুরাত ৪৯:১০)—এই ভ্রাতৃত্বের দাবি পূরণে প্রয়োজন সমন্বিত কূটনীতি, মানবাধিকার-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইন ও দ্রুত-ত্রাণ-মেকানিজম, যাতে আঘাত লাগলে উম্মাহর "এক দেহ" অবধারিতভাবে সাড়া দেয়।

৫. খিলাফাতুল-আর্ধ ও সবুজ উন্নয়ন

মানুষের ভূপৃষ্ঠীয় তত্ত্বাবধায়ক-স্বত্ব কেবল উৎপাদনমুখী নয়; এটি রক্ষামূলকও। নবী ﷺ-এর গাছ লাগানোর উৎসাহ, উট-পাখি-ডিম সংরক্ষণের নির্দেশ ইত্যাদি পরিবেশনীতি আজ একে 'সবুজ শরিয়া'-র কাঠামো দেয়। পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তি, পানি-ব্যবস্থাপনা ও কার্বন-ক্রেডিটে ইসলামী অর্থায়নের ঐক্যবদ্ধ বিনিয়োগ বিশ্ব-জলবায়ু-ন্যায়ের মাপকাঠি স্থাপন করতে পারে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার অনুভূতিপূর্ণ উক্তি— "আদল স্থাপিত হলে কাফির রাষ্ট্রও স্থায়ী হয়; জুলুম কায়েম হলে মুসলিম রাষ্ট্রও টেকে না"—অতঃপর আম্মুলীগত সত্যে রূপ নেয়। সুতরাং উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা মানে ন্যায়ের ন্যূনতম মানদণ্ড নিশ্চিত করা, যা ইসলামি হিসাবেই নয়—আধুনিক মানবাধিকারের পরিমাপে-ও শ্রেষ্ঠ নজির।

এই থিসিস তার গবেষণা-তথ্য, দলিল ও বিশ্লেষণে একটি পূর্ণাঙ্গ পথনকশা উপস্থাপন করেছে—যাতে আলেম-উলামা ইসলাহি দৃষ্টিতে, নীতিনির্ধারক প্রশাসনিক দৃষ্টিতে, গবেষক প্রমাণভিত্তিক দৃষ্টিতে এবং তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি-সৃজনশীল দৃষ্টিতে একত্রে কাজ করতে পারেন। যদি এ কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়, তবে ঐক্য—আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, দুনিয়ার ইনসাফ ও আখিরাতের নাজাত—তিনটিই একসাথে অর্জনের দ্বার উন্মোচন করবে। এবং তখন, আল-কুরআনের আশ্বাস "وَعْدَ اللَّهِ"—আল্লাহ্‌র বিজয়-সংবাদ—বন্ধ হয়ে থাকা হৃদয়ের দরজায় আবারও সক্রিয় সত্যে ধ্বনিত হবে।

## রেফারেন্স -

১.মাসিক আলকাউসার
লেখক -মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

২.মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও ঐক্য
লেখক -মাওলানা আব্দুল হাই ফারুকী

৩.আলী, আমির. The Spirit of Islam.
৪. গোল্ডজিয়ার, ইগনাজ. Introduction to Islamic Theology and Law.
৫. হুদা, ক্বারী মুহাম্মদ সাঈদ. ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
৬.ওয়াট, ডব্লিউ. মন্টগোমারি. Muhammad: Prophet and Statesman.
৭.মাহমুদ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা